KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজপত্র (SABUJ PATRA)	Size : 7.5" x 6"
Vol. & Number : 7/1 7/2 7/5 7/6	Year of Publication : বৈশাখ ১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ ভাদ্র ১৩২৭ আশ্বিন ১৩২৭
	Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

শিল্পীর সাধনা।

—ঃ০ঃ—

একান্ন বৎসর বয়সে ইরাণ-তুরাণের বাদশা হুশেন শাহ্ যখন সাতান্ন সংখ্যক বেগমের পাণি-পীড়ন করলেন, তখন—তখন কে জান্ত যে তাঁরই রাজপ্রাসাদে আরব্য উপন্যাসের নিছক রূপকথাগুলোর একটা এসে নিজের বাস্তবতা প্রমাণ করে' যাবে!

সে যাই হোক্। বাদশা নতুন বেগমের পাণি-পীড়ন করে' তাঁর হারেমে পুরলেন, এদিকে সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দরবারের আমীর ওমরাহ্‌দের মধ্যে কেমন করে' জানাজানি হয়ে গেল যে, নতুন বেগমের মত সুন্দরী ত্রিভুবনে নেই। অপ্সরী?—অপ্সরীরা ত সব চির-যৌবনা। যা চিরদিনের, যার ক্ষয়বৃদ্ধি নেই, যা স্থির, তা হাজার সুন্দর হোক কিন্তু তাতে মোহের অবসর নেই। ফুলগুলো ফুটে উঠে ঝরে' যায় বলেই ত 'ওর সৌন্দর্য্য মুহূর্ত্তের তরে নিবিড়তম হ'য়ে দেখা দেয়, সেই জন্যেই ওর মোহ অনন্ত কালের। নতুন বেগমের ভোম্‌রা রঙের রেশমী চুলের রাশ যে একদিন শণের নুড়ি হ'য়ে উঠবে—তার আঙুরের রসে ভিজান হিঙ্গুল রঙের ঠোঁট দুখানি যে একদিন শুকিয়ে চামড়ার মত হ'য়ে উঠবে—তাজা ফুলের মত গাল দুটো যে শুকনো পাতার মত চুমড়ে যাবে—চোখের কোণ থেকে তড়িৎ ঢালাঢালি যে আর চলবে না—তার বুক যে আর দুলবে না, গ্রীবা যে আর হেলবে না, হৃদয় যে আর টলবে না—এই চিন্তাই যে

হুশেন শাহ্‌কে চতুর্গুণ মাতিয়ে তুলেছে। সুতরাং অপ্সরী ?—না, নতুন বেগমের সঙ্গে অপ্সরীর তুলনাই হয় না। অপ্সরী ত নয়ই—মানব মানবীর মধ্যেও এমন রূপ আর কখনও স্পষ্ট হয় নি—আর ভবিষ্যতেও হবে কিনা সে বিষয়ে বাদশা হুশেন শাহের ঘোর সন্দেহ।

কিন্তু আমীর ওমরাহ্‌দের মধ্যে নতুন বেগমের রূপের কথা রটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা আপশোষের কথাও জেগে উঠল। এমন সুন্দরী যে নূতন বেগম—যার দেহে বিশ্বকর্ম্মা তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রতিভার ছাপ অঙ্কিত করে' দিয়েছেন—যার তুল্য সুন্দরী সসাগরা পৃথিবীতে নেই, অমরাবতীতে নেই, গন্ধর্ব্বলোকে নেই—তেমন রূপ একদিনের জন্যেও কারো নয়নগোচর হবে না, এই হচ্ছে তাঁদের আপশোষের কথা। তাঁদের মধ্যে দু' একজনা দার্শনিক ওমরাহ্ তাঁদের লম্বা শুভ্র দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে গালিচার বুনোনো রঙিন ময়ূর-গুলোকে নিরীক্ষণ করে' করে' বলতে লাগলেন—তা আসলে সৌন্দর্য্য জিনিসটা সকলের জন্যেই হওয়া উচিত—বিশেষত রূপ দেখলে রূপের কোনো ক্ষতি নেই অথচ দর্শকের মহা লাভ।

আমীর ওমরাহ্‌দের কানাকানি বাদশা হুশেন শাহের কানে পৌঁছিতে বড় বিশেষ বিলম্ব হ'ল না! হুশেন শাহ্ ছিলেন প্রজারঞ্জক রাজা। কাজেই আমীর ওমরাহ্‌দের এই আপশোষের কারণ দূর করবার জন্যে ইচ্ছা করলেন। তাই মনস্থ করলেন যে, নতুন বেগমের একখানি পূর্ণায়তন তস্‌বীর অঙ্কিত করিয়ে তাঁর আমদরবারের বিশাল কক্ষে মস্‌নদের পিছনে দেয়ালের গায়ে ঝুলিয়ে দেবেন। বাদশা মনে মনে এই ব্যবস্থা ঠিক করেই তাঁর প্রধান উজিরকে ডাকলেন—"ফজলু খাঁ।"

ফজলু খাঁ পামিরের মাথার উপরকার বরফের মত সাদা লম্বা দাড়ি হেলিয়ে এসে কুর্ণিস করে' দাঁড়াল—"জাঁহাপনা"—

বাদশা বললেন—"উজির, বর্ত্তমানে এ সসাগরা পৃথিবীতে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী কে ?"

উজির হাতের পাঁচ আঙুল তাঁর লম্বা দাড়ির মধ্যে চালাতে চালাতে স্মৃতিশক্তিটাকে উগ্র করে' নিয়ে উত্তর করলেন—"জাঁহাপনা, বর্ত্তমানে এ সসাগরা পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী হচ্ছে হিন্দুস্থানের কোশল রাজসভার চিত্রকর—নাম মৌকুল দেব।"

হিন্দুস্থানের নাম শুনে বাদশা মুহূর্ত্তের জন্যে চিন্তান্বিত হলেন—যেন তাঁর মনে কোন সংশয় উদিত হয়েছে; কিন্তু তৎক্ষণাৎ যেন সে সংশয়ের একটা সমাধান করে' বললেন—"ফজুল খাঁ, কোশল রাজ-সভার চিত্রশিল্পী ইরাণ-তুরাণের বাদশার দরবারের তরফ থেকে ইস্পাহানে আমন্ত্রিত হোক।

ফজলু খাঁ তাঁর উষ্ণীষ হেলিয়ে কুর্ণিশ করে' বললেন—"প্রবল প্রতাপান্বিত সুজনের রক্ষক দুর্জ্জনের শাসক ইরাণ-তুরানের বাদশা হুশেন শাহের যে আজ্ঞা।"

তার পরদিন পূব গগনে ঊষাসুন্দরী যখন আপনার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করবেন কি করবেন না ভাবছিলেন, তখন ইস্পাহানের প্রশস্ত পাথর-বাঁধা রাজপথ কাঁপিয়ে বাদশার পাঞ্জাঙ্কিত পত্র নিয়ে তুরুক সোয়ার কাবুলের পথে হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা করল। দ্রুতগামী অশ্বখুরের খটাখট্ শব্দে নিদ্রিত নাগরিকেরা চকিত হ'য়ে উঠে বসল। বেলা হ'লে ইস্পাহানের বাজারে বাজারে রটে গেল যে,

হিন্দুস্থান থেকে চিত্রকর আসছে—নতুন বেগমের তসবীর আঁকবার জন্যে।

(২)

বাদশা আমীর ওমরাহ্‌দের নিয়ে তাঁর খাস দরবারে বসে' ছিলেন। ইরাণ-তুরাণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি তায়েজউদ্দিন সেদিন হেমন্ত-সন্ধ্যার মত করুণ কণ্ঠস্বরে বাদশা-সমীপে সুন্দরী তরুণীর অশ্রু-ভেজা ব্যথিত কালো আঁখি-তারার মত একটা নব রচিত গজল্ সারেঙ্গী সহযোগে গান করছিলেন। গজল্ বলছিল—"রূপোর দেয়ালী লেগেছে— এমনি নিবিড় জোছনা, যেন মনে হয় তা মুঠো বেঁধে দলা পাকিয়ে ঢিল ছোঁড়াছোঁড়ি খেলা যায়, শিশির-ভেজা পাতায় পাতায় জোছনা ছল্‌কে উঠে পিছলে পড়ছে—দূর এলবুরুজ পাহাড়-তলীর বুল্‌বুল্‌রা সব আর সেদিন ঘুমুতে যায় নি—তাদের গানের সুর ঘন জোছনার বুক চিরে চিরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে—এমনি রাতে নিঠুরা পিয়ারী বাহুর বাঁধন আল্‌গা করে' কাউকে কিছু না বলে' ক'য়ে কোন্ অজানার পথ ধরে' কোথায় চ'লে গেল—কোথায় গেল....."

'চারিদিক মেঘে মেঘে ছেয়ে গিয়েছে—কালো কালো মেঘ, বিদ্যুৎ বুকে করা মেঘ। এলবুরুজ পাহাড়তলীর ময়ূরের দল পেখম তুলে নৃত্য করে' করে' তাদের কেকা রবে চারিদিক মুখর করে' তুলেছে। বারি ঝর্‌তে আরম্ভ করল,—ঝর্ ঝর্ ঝর্—বিরাম নেই বিরতি নেই—কত দিনকার কার অশ্রু—কোন্ অলকার কোন্ অপ্সরীর—এমনি বাদল-বুকের মধ্যে বসে' বসে' কে যে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে—এমন দিন, তবুও পিয়ারী ফিরে এল না—কেন এল না....."

"পিয়ারী কেমন করে' ফিরবে—পিয়ারী যে পথ ধরে' গিয়েছে, সে ত ফেরবার পথ নয়—সে যে কেবল যাবারই পথ, সে-পথ—সে যে মরণের পথ....."

সারেঙ্গীর মিষ্টি সুরের সঙ্গে কবির মিষ্টি সুর মিলে গজলের ব্যথা-ভরা কাহিনী, বাদশার খাস দরবারের প্রশস্ত কক্ষের কোণে কোণে কোন্-হারিয়ে-যাওয়া কাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। যে আমীর ওমরাহ্‌রা যুবক, তাদের কি একটা ব্যথার আনন্দে বুক ফুলে উঠল, টলে উঠল—বাদশার খুড়ো আশী বছর বয়সের বৃদ্ধ বৈরাম খাঁর পর্য্যন্ত কুয়াশা-ঢাকা চোখ দুটো ছল্‌ছল্ করে' উঠল। গান শেষ করে' কবি সারেঙ্গী ও ছড়টা গালিচার উপরে নামিয়ে রাখলেন—চারিদিকে নিস্তব্ধতা, কেবল সদ্য সমাপ্ত গজলের সুর বাতাসের বুক চিরে আকাশের গায়ে গায়ে একটা রেশের চিহ্ন এঁকে দিয়ে দিয়ে দূর হতে দূরান্তরে চলে যেতে লাগল—মুহূর্ত্ত ধরে' যেন কারো নিশ্বাস প্রশ্বাসও পড়ছে না—এমনি নিবিড় নিস্তব্ধতা। তারপর দরবারের সবাই যেন হঠাৎ চমক ভেঙ্গে জেগে সমস্বরে বলে' উঠলেন—"ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ!"

বাদশা সস্মিত হাস্যে কবির দিকে ফিরে বললেন—"তায়েজ, তোমার কাব্য সাধনা, সঙ্গীত সাধনা, যন্ত্র সাধনা, সবই সার্থক!"

কবি তায়েজ তাঁর বিনম্র শির আরও নত করে' কি বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় উজির ফজলু খাঁ প্রবেশ করে' বাদশা-সমীপে নিবেদন করলেন—"জাঁহাপনা, হিন্দুস্থান হ'তে কোশল-রাজসভার চিত্রশিল্পী মৌকুল দেব ইরাণ-তুরাণের বাদশা, দুর্বিলের রক্ষক দুর্জ্জনের শাসক প্রবল প্রতাপান্বিত হুশেন শাহের দরবারে হাজির।"

বাদশা বললেন—"তাকে এইখানে নিয়ে আসা হোক।"

উজির তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেলেন, আবার পরক্ষণেই ফিরে এলেন—সবাই দেখলেন, তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করল এক অতি সুন্দর তরুণ যুবক।

অতি সুন্দর তরুণ যুবক। তার চোখ দুটোতে যেন বিদ্যুতের রেখা টানা—কুঞ্চিত কেশ গুচ্ছে গুচ্ছে এসে তার বলিষ্ঠ স্কন্ধ ছেয়ে ফেলেছে—অতি চিক্কণ গোঁফের রেখার চিহ্ন তার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনের ঘোষণা করছে—আঙুলগুলো যেন ছবির মত সুশ্রী—বাদশা বিস্ময় প্রকাশ করে' বললেন—"এই যুবক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকর?"

যুবক তার মাথা অবনত করল, উজির ফজলু খাঁ উত্তর দিলেন—"হাঁ জাঁহাপনা।"

"এমনি তরুণ বয়সে!"

উজির উত্তর দিলেন—"জাঁহাপনা, প্রতিভাসুন্দরী তরুণের গলেই তাঁর বরমাল্য প্রদান করতে ভালবাসেন।"

বাদশা প্রসন্ন দৃষ্টিতে শিল্পীর দিকে ফিরে বললেন—"সুন্দর বিদেশী যুবক, চিত্রবিদ্যায় তোমার কতদূর পারদর্শিতা?"

যুবক উত্তর দিলে—"জাঁহাপনা, কবি, চিত্রকর, গায়ক এদের পারদর্শিতার মাপযন্ত্র অন্যের কাছে। আমার যে কি রকম পারদর্শিতা তা আমি নিজে কেমন করে' বলব? তবে আমার অঙ্কিত চিত্রে হিন্দুস্থানের অনেক নৃপতি অনুগ্রহ করে' সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।"

বাদশা বললেন—"শোন যুবক, ইসলাম-রমণী কোনদিন বিধর্ম্মী-পুরুষের কাছে তার মুখাবরণ উন্মোচন করবে না, শাস্ত্রের নিষেধ—না দেখে তুমি তার আলেখ্য অঙ্কিত করতে পারবে?"

শিল্পী বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—"না দেখে কি করে' ছবি আঁকা চলতে পারে জাঁহাপনা?"

বাধা দিয়ে বাদশা জিজ্ঞাসার সুরে বললেন—"কেবল তার বর্ণনা শুনে।"

যুবক বললে—"এমন কবি কে আছে জাঁহাপনা যে শব্দ, অর্থ ও সুর দিয়ে রক্তমাংস ও বর্ণকে এমনি করে' মূর্ত্তিমান করে' তুলতে পারে যা আবার রঙে ও তুলিতে পরিবর্ত্তিত করা যেতে পারে?"

গৌরবান্বিত দৃষ্টিতে বাদশা উত্তর দিলেন—"বিদেশী যুবক! আছে, ইরাণ-তুরাণের শ্রেষ্ঠ কবি—তার কণ্ঠসুরে শরৎ-উষার উজ্জ্বল আকাশ সান্ধ্য গগনের মত ব্যথিত হ'য়ে ওঠে—হেমন্ত-সন্ধ্যার করুণ রাগিণী বসন্ত-উষার মত হাস্যময় হ'য়ে ওঠে—যার সারেঙ্গীর আলাপে প্রচণ্ড নিদাঘে বর্ষার শৈত্য আমন্ত্রন করে' আনে—শীতের শুভ্র মাটীতে সবুজ রঙ জাগিয়ে তোলে—যুবক তুমি নিজেই বিচার করবে"—বাদশা কবি তায়েজকে গান করতে আদেশ করলেন।

সারেঙ্গীর সুর জেগে উঠল—কিশোরী প্রিয়ার সলজ্জ চাউনির মত মিষ্টি, তার রেশমী চুলের স্পর্শের মত মোলায়েম—সে সুরের রেশ প্রিয়ার অঙ্গের স্পর্শেরই মত শ্রবণেন্দ্রিয়কে বুলিয়ে যায়।

"সুরমা-আঁকা চোখ—পিয়ারি সে কেমন চাতুরি?—রজনীর কালো আঁধারের মাঝে পুঞ্জ মেঘের বুক থেকে বিদ্যুৎ কেমন জিলিক্ হানে?—তাই পিয়ারীর কালো চোখের চার পাশে সুরমা আঁকা পিয়ারীর কালো চোখের তারা সে মেঘ—চোখের পাতায়-আঁকা সুরমা সে রজনীর আঁধার—পিয়ারীর দৃষ্টি সে বিদ্যুৎ—সে-বিদ্যুৎ

কেমন উজ্জ্বল, কেমন নিবিড়, কেমন তীব্র—সুরমা আঁকা চোখ—পিয়ারি সে কেমন চাতুরী ?"

"সুরমা-আঁকা চোখ—পিয়ারি জানি জানি সে কেমন চাতুরী। পিয়ারি যে চোখ দুটোতে সুরমা ঢেকে তার সারা দেহের আকাঙ্ক্ষা-রাশিকে গোপন করতে চায়—তার মনের শঙ্কা সঙ্কোচ সরম স্পষ্ট করে' তুলতে চায়—তার চঞ্চল দৃষ্টিকে নিবিড় করতে চায়—তার হাস্যময় দৃষ্টিকে ব্যথা ভরা দেখতে চায়—সুরমা-আঁকা চোখ—পিয়ারি জানি জানি সে কেমন চাতুরী।"

গান থামল—রইল শুধু একটা সূচী-সূক্ষ্ম রেশের আধ-লুপ্ত আধ-সুপ্ত রণন্।

তরুণ চিত্রকর প্রশংসমান নেত্রে বললে—"ইরাণ-তুরাণের কবি, হিন্দুস্থানের চিত্রকরের অভিবাদন গ্রহণ করুন।" তার পর বাদশার দিকে ফিরে বললে—"জাঁহাপনা, কবি তায়েজের ক্ষমতা অসাধারণ। কবির সুরে সুরে আমার তুলি চলবে—তাঁর গানের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বেগমের ছবি ফুটে উঠবে—তাঁর চোখ জেগে উঠবে—তাঁর বুক দুলে উঠবে—গণ্ডে তাঁর গোলাপ ফুটবে—হাতে তাঁর চাঁপার কলি জাগবে—পায়ে তাঁর রক্তকমল বিকশিত হবে—তাঁর ওড়না উড়বে, বেণী দুলবে, ঘাগ্‌রা ঝুলবে; কিন্তু তাঁর আত্মার কথা আমি বলতে পারব না জাঁহাপনা। কবি তায়েজের সুরের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বেগমের বাহিরকেই আমি দিতে পারব—জাঁহাপনা, তাঁর আত্মার সন্ধান আমি দিতে পারব না।"

বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন শিল্পী ?"

শিল্পী উত্তর দিলে—"জাঁহাপনা, আত্মা যে সাম্‌না সাম্‌নি দেখবার

জিনিষ—হাজার বর্ণনাতেও তার আসল পরিচয় নেই। শিল্পীর আত্মা দিয়ে নতুন বেগমের আত্মা স্পর্শ করতে না পারলে তার তুলির সঙ্গে তা কখনও ধরা পড়বে না। এ আত্মায় আত্মায় স্পর্শ অনুবাদের ভিতর দিয়ে হ'তে পারে না। জাঁহাপনা, আমি ছবি আঁকব; কিন্তু তাতে আত্মার সন্ধান করবেন না।"

বাদশা বলে' উঠলেন—"কিন্তু নতুন বেগমের যে দেহের চাইতে আত্মা সুন্দর—আত্মা সুন্দর বলেই ত তার দেহ সুন্দর—সেই আত্মাকে বাদ দিয়ে শুধু দেহের ছবি আঁকা—যেন গন্ধ বাদ দিয়ে গোলাপ ফোটান—নেশা বাদ দিয়ে মদ চোঁয়ান; কিন্তু বিধর্ম্মার কাছে ইস্‌লাম-রমণী কেমন করে' মুখ খুলবে ?—উপায় কি ?" বাদশা তাঁর দর-বারের আমীর ওমরাহ্‌দের দিকে তাকিয়ে উজিরকে সম্বোধন করে বললেন—"ফজলু খাঁ, উপায় কি ?"

ইরাণ সাম্রাজ্যের প্রধান উজির বিমনা হলেন। আমীর ওম-রাহ্‌রা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। সভা নিস্তব্ধ—চারিদিকে একটুকু শব্দ নেই। সেই নিস্তব্ধতার মাঝে বৈরাম খাঁ তাঁর সুদীর্ঘ শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তার পর তাঁর দীর্ঘায়ত শরীর বেঁকিয়ে কুর্ণিস করে' বললেন—"জাঁহাপনা, উপায় আছে। নতুন বেগমকে বিধর্ম্মীর সাম্‌নে মুখ খুলতে হবে না—তা একখানি দর্পণের সামনে করলেই চলবে। সেই দর্পণে প্রতিবিম্বিত নতুন বেগমকে দেখলেই শিল্পীর উদ্দেশ্য সফল হবে। শাস্ত্রও রক্ষা হবে—কর্ম্মও ঠেকা থাকবে না।"

বৈরাম খাঁর কথা শুনে সবার বিষণ্ণ মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। বাদশা প্রশংসমান নেত্রে খুল্লতাত বৈরাম খাঁর দিকে তাকিয়ে উজিরকে

লক্ষ্য করে বললেন—"ফজলু খাঁ, খুল্লতাত বৈরাম খাঁর যুক্তি গৃহীত হোক।"

দরবার ভাঙল। আমীর ওমরাহ্‌রা বৈরাম খাঁর বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতে করতে নিজ নিজ আবাসে ফিরলেন।

(৩)

দ্বারে দ্বারে পুরু রেশমি পরদা—তারি পাশে পাশে উলঙ্গ কৃপাণ হাতে যমদূতের মত কালো হাব্‌সী খোজা। এখানে বুঝি ক্ষুদ্র মধু-মক্ষিকাটিরও প্রবেশ করবার পথ নেই। এখানে বুঝি আর কোন শব্দ নেই, কেবল দুধের মত সাদা কঠিন পাথরের উপরে রক্ত কমলের মত রাঙা কোমল পা ফেলে চলে'-যাওয়া রূপসীদের নূপুর-নিক্কন, কেবল লিলায়িত তনুর ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে তাদের জঙ্ঘা-স্পর্শ-সুখে বিহ্বল ঘাগরার খস্ খস্ শব্দ, কেবল তাদের কৌতুক-উচ্ছ্বাস-উদ্দীপ্ত হাসির ছন্দময় গিটকিরি, কেবল কত কত উৎস হতে উচ্ছ্বসিত গোলাপজলের বিরতিহীন ঝর্ ঝর্ শব্দ। এখানে বুঝি আর কোন গন্ধ নেই—কেবল কত কত তরুণীদের নিশ্বাস-বিচ্ছুরিত সুরভি, কেবল তাদের সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ বেণী-কুণ্ডল হতে উৎসারিত স্বপ্নময় গন্ধাবলেপ, কেবল তাদের সারা অঙ্গ হতে উৎসৃষ্ট এক আবেশময় আভাস। এখানে বুঝি আর কোন রূপ নেই, কেবল সদ্য ফোটা গোলাপরাশির স্তবক, কেবল ফুল্ল প্রস্ফুটিত চম্পকদলের উগ্রতা। এখানে বুঝি আর কোন রস নেই, কেবল সাকির আপন-ভোলা বিফলতা, কেবল সিরাজির সকল-ভোলা মাদকতা। মানুষ জীবনকে ধরে' রাখতে পারে না, কিন্তু যৌবনকে ধরে' রাখতে চায়। এমনি বাদশার হারেম।

এখানে কত কত রূপসী তরুণীর কমল-চোখের কোমল দৃষ্টি কুয়াশায় ঢেকে গেল—কোমল মুখের কমল-হাসি শুকিয়ে উঠল—গ্রীবা আর হেল্‌ল না, বুক আর দুল্‌ল না, চরণ আর চল্‌ল না; কিন্তু শেষ নেই, আবার কত কত নব নব তরুণী এসে তাদের রূপ-যৌবন দিয়ে এখানটাকে ভরে' তুলল। বাদশা হুশেন শাহের কালো চুল শাদা হ'য়ে গেল, দন্তাভাবে গণ্ড শীর্ণ হয়ে পড়্‌ল, তড়িতাভাবে দৃষ্টি মলিন হয়ে উঠল; কিন্তু এখানটায় তাঁর রূপ-যৌবনের সম্পদ অব্যাহত। এমনি ইরাণ-তুরাণের বাদশার হারেম।

সেই হারেমে কত কত দ্বারে কত কত পরদা সরিয়ে কত কত কক্ষ অতিক্রম করে' কত কত হাবসী খোজার ক্রূর শার্দ্দূল-দৃষ্টির সামনে দিয়ে তরুণ শিল্পী বাদশা হুশেন শাহ্ ও উজির ফজলু খাঁর সঙ্গে প্রবেশ করল। হারেমে বিদেশী বিধর্ম্মীর আভাস পেয়ে বেগমদের পোষা ময়ূরের দল একবার ভীষণ কেকারবে যেন তাদের আপত্তি জানিয়ে দিল। তার পর হারেমের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যাদুমন্ত্র বলে নিমেষে যেন একটা পুরু নিস্তব্ধতার গালিচা বিছিয়ে গেল। কত কত মরাল গতির ছন্দে ছন্দে শিঞ্জিনী-নিক্কনার অর্দ্ধেক ফুটে আর অর্দ্ধ ফোটার আর অবসর পেলে না—কত কত হাসির গিটকিরি মাঝপথে এসে হঠাৎ চকিতে থেমে গেল—যেন সজীব যা যেখানে ছিল সব সেই সেইখানেই সেই অবস্থাতেই সহসা প্রস্তরের মত কঠিন হ'য়ে গেল—চারিদিকে কেবল নিস্তব্ধতা—সেই নিবিড় নিস্তব্ধতার মাঝে কেবল গোলাপবারির ঝর্ ঝর্ শব্দ। সেই নিস্তব্ধতার মাঝে বাদশা শিল্পী ও উজিরকে নিয়ে একটি প্রকাণ্ড কক্ষে প্রবেশ করলেন।

কক্ষের এক পার্শ্বে দেয়ালে-গাঁথা এক সুবৃহৎ দর্পণ—একটা ক্রুদ্ধ-চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ সাটিনের মাঝখানে জড়োয়া কাজের এফটা প্রকাণ্ড অর্দ্ধচন্দ্র আঁকা পরদায় আগাগোড়া ঢাকা। বাদশা উজির ও শিল্পী তিন জনে এসে সেই দর্পণের সামনা সামনি কক্ষের অপর প্রান্তে দাঁড়ালেন। অদৃশ্য হস্তের টানে পরদা সরে গেল। রত্নখচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট নতুন বেগমের প্রতিবিম্ব দর্পণের গায়ে ফুটে উঠল—

যেন মসী-লিপ্ত অমাবস্যার অন্ধকারের বিরাট গহ্বর হতে শরৎ পূর্ণিমার লক্ষ চাঁদ সহসা এককালে জেগে উঠল—যেন কঠিন রসহীন প্রাণহীন পাষাণের বুক চিরে এককালে-ফোটা বসোরার গোলাপ ফুটে উঠল—যেন ঘোর অমানিশায় পুঞ্জ মেঘের বুক চিরে বিদ্যুতের রেখা ফুটে অচঞ্চল হয়ে চারিদিক উদ্ভাসিত করে' রাখল—যেন—। বাদশা বললেন—"শিল্পী, এই তোমার আলেখ্য।"

বাদশা শিল্পীর দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলেন, বুঝলেন তাঁর কথা শিল্পীর কানে যায় নি—তার দৃষ্টি দর্পণে নিবদ্ধ—শিল্পী মন্ত্রমুগ্ধ—বাহ্যজগত তার কাছে লোপ পেয়েছে। বাদশার ঠোঁট দুখানিতে একটা তৃপ্তির, একটা গৌরবের, যেন একটা বিজয়ের নিঃশব্দ হাসির রেখা অঙ্কিত হ'য়ে গেল।

শিল্পীর দৃষ্টিতে কি ছিল—দর্পণে প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তির অবনত চোখ দুটি ধীরে ধীরে যেন মন্ত্রচালিত হ'য়ে উত্তোলিত হয়ে মন্ত্রমুগ্ধ শিল্পীর প্রতি নিবদ্ধ হল—সেই চোখ দুটিতে বিস্ময়ের একটা ক্ষণিক প্রভা যেন মুহূর্ত্তের জন্য খেলে গেল—তার পর আজীবন সংগোপিত অনন্ত গোপন আকাঙ্খা আকুলতার আড়াল থেকে দুটি তরুণ চোখ আর দুটি তরুণ চোখের সঙ্গে মিলিত হ'ল—দর্পণের মূর্ত্তি যেন তার রন্ধ্রে

রন্ধ্রে একটা পুলক নিয়ে কেঁপে উঠল—শিল্পীর স্নায়ুতে স্নায়ুতে যেন একটা তড়িৎ প্রবাহ চারিয়ে গেল—তার পর নারীর দৃষ্টি অবনত হ'য়ে গেল—পুরুষের চোখে পলক পড়ল না। দর্পণের মসৃন গায়ের উপরে মনে হ'ল কে যেন সিঁদুর ঢেলে দিল। অদৃশ্য হস্তের টানে পরদার দর্পণ ঢাকা পড়ল। শিল্পী চমক ভেঙ্গে জেগে উঠল—দেখলে চারিদিক যেন সন্ধ্যার মত মলিন হ'য়ে উঠেছে।

বাদশা বললেন—"শিল্পী—"

তরুণ যুবক সংযত স্বরে বললে—"জাঁহাপনা, আমি হিন্দুস্থানের রাজন্যবর্গের অনেক অনেক অন্তঃপুর-মহিলাদের দেখেছি, কিন্তু এমন রূপ কখনও আমার নয়নগোচর হয় নি।"

স্মিত হাস্যে বাদশা বললেন—"শিল্পী, যা চোখে দেখলে, তাই যদি চিত্রপটে ফুটিয়ে তুলতে পার, তবে লক্ষ স্বুবর্ণ মুদ্রা তোমার পুরস্কার।"

শিল্পী উত্তর করলে—"জাঁহাপনা, আমাকে ছয় মাস সময় দিন। আর আমি চাই একটি নির্জ্জন নিভৃত স্থান, অতি নিভৃত, যেখানে বাইরের জগতের রাগ রঙ্গ হাসি অশ্রু আমার প্রাণে কোন ঢেউ-ই তুলবার সুযোগ পাবে না—যেখানে একান্ত ভাবে থাকবে আমি আর আমার আলেখ্য।"

বাদশা উজিরের দিকে ফিরে বললেন—"ফজলু, মতিমঞ্জিলে শিল্পীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হোক্।"

তিনজনে হারেম ত্যাগ করলেন।

আবার তরুণীদের কলকণ্ঠ ফুটে উঠল। তাদের পায়ে পায়ে কত কত লাস্য নিয়ে মুঞ্জুর নিক্কণ জেগে উঠল, তাদের হাস্যোচ্ছ্বাস কক্ষে

কক্ষে রণিত হ'য়ে উঠল; কিন্তু সেদিন সেই হারেমে একটি নিভৃত কক্ষে একটি তরুণীর অন্তরে অন্তরে একটা নবীন স্বপ্নের আভাসে যে একটা নব তন্ত্রী বাজতে লাগল, তার সঙ্গে সেই তুচ্ছ প্রতিদিনকার উদ্দেশ্যহীন হাসি-গানের কোনই মিল রইল না।

(৪)

সসাগরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকর সে, দেশ বিদেশে কোটী কোটী নর নারীর মুখে মুখে তার নাম ফিরে বেড়াচ্ছে; কিন্তু সে নিজে এতদিন কোথায় ছিল? কোথায় আপন-ভোলা হ'য়ে ঘুরছিল? কি জীবন সে এতদিন যাপন করেছে? কি জীবন? কোন্ একান্ত বাইরে বাইরে সে তুলি আর রঙ নিয়ে কেবল কি এক তুচ্ছ খেলা করে' বেড়িয়েছে? শিল্পী সে, কিন্তু এই এতদিন তার কাছ থেকে জীবনের অমৃতের উৎস এমনি করে' গুপ্ত হয়েছিল যে, তার অস্তিত্বের সন্দেহমাত্র তার মনে জাগে নি! তার তুলির মুখে কত কত সুন্দরীর ভোম্‌রা-কালো আঁখি-তারা বিশ্ব-বিমোহিনী দৃষ্টি নিয়ে জেগে উঠেছে, তার তুলির সোহাগে সোহাগে কত কত তরুণীর হৃদয়ের উপরে অঞ্চল-ঢাকা ভরা-বুক আধ আভাস নিয়ে মাথা তুলেছে, তার তুলির আদরে আদরে কত কত কমলের মত হাত চাঁপার কলির মত আঙুল নিয়ে ফুটে উঠেছে, কিন্তু তার পিছনে কি ছিল? আজ যে সে জানে যে, তার পিছনে ছিল তার কেবল অপূর্ণতা—আর অপূর্ণতা—আর অপূর্ণতা। তার পিছনে ছিল না শিল্পী তার সবখানি নিয়ে, ছিল না শিল্পীর নিগূঢ় জীবনের নিবিড় চরম আনন্দের অনুভূতি, ছিল না শিল্পীর নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে দেওয়া। সে

কেমন করে' কাটিয়েছে, কেমন করে'!—এই অসম্পূর্ণতা নিয়ে, এই বিরাট শূন্যতা নিয়ে—কেমন করে' সে এতদিন ছিল, কেবল এই রঙ তুলি ও চিত্রপটের বিরাট ব্যর্থতাভরা ব্যঙ্গ নিয়ে? হায়! তার নিগূঢ় আনন্দের উৎসটি এতদিন কে এমন করে' নিষ্ঠুর ভাবে তার অলক্ষ্য করে' রেখেছিল!

কিন্তু আজ তার কোন্ নিগূঢ় অন্তরের গোপন কক্ষে কোন্ একটা মণি-মুক্তা-খচিত বীণার স্বর্ণ-তারে কার অদৃশ্য অঙ্গুলির স্পর্শ পড়ল—সেই স্পর্শে যে সুর বেজে উঠল—সেই সুরে তার আজ একি হ'য়ে গেল! একি বেদনা, একি আনন্দ! তা ত আজ তার বুঝবারও ক্ষমতা নেই—আজ যে কেমন তার বেদনা আর আনন্দ একেবারে ছড়িয়ে গেছে, দুটোকে আর ত তার আলাদা করবার উপায় নেই—আজ যে কেমন তার মনে হচ্ছে, বেদনাও আনন্দ—আনন্দও বেদনা। মৌকুল, মৌকুল, এতদিন কোন্ মরুভূমির মধ্যে পিপাসা নিবারণের জন্যে ঘুরে ঘুরে মরছিলে!

ঐ যে নিগূঢ় গোপন বীণার তারে ঝঙ্কার—কি ঐশ্বর্যময় সে ঝঙ্কার—সেই ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যে আজ এক নিমেষে সব নিবিড় অর্থপূর্ণ হয়ে উঠল—চোখে যে কিসের অঞ্জন লেগে গেল—এই ধরিত্রীর মাটিতে মাটিতে এত গান, এত সুখ, এত সৌন্দর্য্য—এই যে মতিমঞ্জিল, ঐ যে তরুশ্রেণী, ঐ যে কুসুমকুঞ্জ, ঐ যে লতাবিজন - সব যেন কেমন উজ্জ্বল কেমন সজীব হ'য়ে উঠল। শিল্পী, শিল্পী, তুমি এতদিন কোন্ অন্ধ-করা অরণ্যে কেবল মুক্তির পথ খুঁজে মরছিলে!

দুটি তরুণ চোখ আর দুটি তরুণ চোখ—তাদের মিলনে এমনি

রহস্যের সৃষ্টি, এমনি অমৃতের উৎস, এমনি দিকে দিকে পুলক জেগে উঠল, আকাশে বাতাসে হিল্লোল খেলে গেল, অল স্থল রঙিন হয়ে উঠল!

সে আজ ছবি আঁকবে—নতুন বেগমের। নতুন বেগম! না—না—না—নতুন বেগম কে? তাকে ত সে তেমন করে' জানে না—তার সঙ্গে ত শিল্পীর কোনই পরিচয় হয় নি। না—না—সে নতুন বেগম নয়—ইরাণ-তুরাণের কেউ নয়—বাদশা হুসেন শাহের কেউ নয়—তার হারেমের কেউ নয়—সে যে শিল্পীর নিভৃত গোপন-মনের মন্দিরের দেবী—যে কোমল স্পর্শে তার হৃদয়-বীণায় মোহন রাগিণী বাজিয়ে তুলেছে—তার দৃষ্টিসম্পাতে তার হৃদয়-পদ্ম প্রত্যেক দলটি নিয়ে ফুটে উঠেছে। না—না—সে নতুন বেগম নয়—ইরাণ-তুরাণের কেউ নয়—বাদশা হুসেন শাহের কেউ নয়—তার হারেমের কেউ নয়—সে যে শিল্পীর নিভৃত গোপন হৃদয়-মন্দিরের প্রণয়িনী—যার গণ্ড কপোল কণ্ঠ শিল্পীর দৃষ্টিতে লাজ-লালিমার রক্তিমাভায় ছেয়ে গিয়েছে—যে শিল্পীর দৃষ্টি বিনিময়ে তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুলক নিয়ে কেঁপে উঠেছে—না, সে বৃদ্ধ হুসেন শাহের নতুন বেগম নয়—সে যে চিরতারুণ্যের জীবন-মন্দিরে যুগযুগান্তরের সঙ্গিনী!

তারি, কেবল তারি ছবি সে আঁকবে? নতুন বেগম? নতুন বেগম?—নতুন বেগম বলে কেউ এই পৃথিবীতে নেই—নেই—নেই। নেই—এই ব্রহ্মাণ্ডে ইরাণ-তুরাণ বলে' কোন স্থান নেই—বাদশা হুসেন শাহ্ বলে' কোন ব্যক্তি নেই—তার হারেম বলে কোন কারাগার নেই—সেখানে নতুন বেগম বলে' কোন বন্দিনী নেই। আছে শুধু অনন্ত শূন্য অনন্ত অবসরের মাঝে দুটি তরুণ তরুণী, দুটি প্রেমিক

প্রেমিকা—আছে শুধু দুটি হৃদয়, চারটি আঁখি, একটি অনন্তকালের নিবিড় চুম্বন। এই আর কিছুই নয়।

কেবল তারই ছবি সে আঁকবে। যে-ছবি সে আঁকবে—কেবলই কি তুচ্ছ রঙ দিয়ে? তুচ্ছ রঙ দিয়ে! তার হৃদয় শোণিতের বিন্দুতে বিন্দুতে যে আলেখ্যের প্রত্যেক অণু পরমাণু প্রাণ পাবে—তার নিশ্বাসে নিশ্বাসে যে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জেগে উঠবে, তার আত্মার স্পর্শে স্পর্শে তা চিত্রপটে ফুটে উঠবে—তুচ্ছ তুলি আর রঙ?—না।

শিল্পী এক মনে মতিমঞ্জিলে ছবি আঁকতে লাগল।

ধীরে ধীরে তার কাছে বাহ্যজগত লোপ পেয়ে গেল। মতিমঞ্জিল তার বিস্তীর্ণ উদ্যান—বিশাল তরুশ্রেণী—নিবিড় লতাবিতান, সব অদৃশ্য হ'য়ে গেল—রইল শুধু তার চোখের সামনে একটি তরুণীর মূর্ত্তি—কুন্তল যার নিবিড়, দৃষ্টি যার গভীর, বক্ষে যার ইঙ্গিত, কক্ষে যার সঙ্গীত, জঙ্ঘা যার বিরহ-কাতর, চরণ যার নিগড় বাঁধা।

শিল্পী এক মনে ছবি আঁকতে লাগল।

(৫)

দেখতে দেখতে ছ'মাস কেটে গেল।

গোধূলির স্বর্ণে স্বর্ণে পশ্চিমাকাশে গৈরিক ওড়্না উড়িয়ে পূরবী রাগিণী বেজে উঠেছে—বাদশা হুশেন শাহ্ ফজলু খাঁকে সঙ্গে নিয়ে মতিমঞ্জিলে এসে উপস্থিত হলেন। শিল্পীকে বললেন—"শিল্পী, তোমার ছ'মাস শেষ।"

শিল্পী আভূমি প্রণত হ'য়ে উত্তর দিলে—"জাঁহাপনা, আলেখ্যও শেষ।"

বাদশা বললেন—"আজ হিন্দুস্থানের চিত্রকরের ক্ষমতা কতদূর, তার বিচার হবে শিল্পী।"

শিল্পী বিনম্র শিরে বহু কক্ষ অতিক্রম করে' বাদশা ও উজিরকে মতিমঞ্জিলের নিভৃততম অংশে একটি কক্ষে নিয়ে এল। গোধূলি লগ্নে কক্ষের মধ্যে আঁধার হ'য়ে এসেছে। শিল্পী রৌপ্য-দীপদানে দুটি দীপ জ্বালিয়ে তার চিত্রপটের দু'পাশে রক্ষা করল। চিত্রপটের উপরে পরদা ঢাকা।

পরদা-ঢাকা চিত্রপটের সামনে এসে বাদশা ও উজির দাঁড়ালেন। শিল্পী ধীরে ধীরে চিত্রপটের উপর থেকে পরদা সরিয়ে নিয়ে এক পাশে এসে দাঁড়াল।

বাদশার কোষের অসি ঝন্‌ঝন্ করে' বেজে উঠল, তাঁর হাতের আকর্ষণে খাপ থেকে তা অর্দ্ধেক বেরিয়ে এল। শিল্পী তৃপ্তির হাস্যে শান্তস্বরে বললে—"জাঁহাপনা, এ আলেখ্য মাত্র।"

ইরাণ-তুরাণের বাদশা লজ্জিত হ'য়ে তরবারি আবার খাপে পুরলেন। কণ্ঠ হ'তে বহুমূল্য মণিহার খুলে শিল্পীর গলায় পরিয়ে দিলেন। তারপর বাদশা আর উজির দু'জনে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে আলেখ্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এ ত রঙ দিয়ে আঁকা ছবি নয়—এ যে মূর্ত্তিমান রক্তমাংসের শরীর! কে বলবে নতুন বেগম আজ বাদশা হুশেন শাহের হারেমে—সে আজ মতিমঞ্জিলের একটি নিভৃত কক্ষে রত্নখচিত সিংহাসনে উপবিষ্টা!

প্রথম বিস্ময়ের কথঞ্চিৎ উপশমে বাদশা বললেন—"শিল্পী, তোমার শক্তি অলৌকিক, ঐশ্বরিক—লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রার পরিবর্ত্তে পাঁচ লক্ষ তোমার পুরস্কার—হিন্দুস্থানের নৃপতিরা না বলে ইরাণ-তুরাণের

বাদশা গুণের আদর করতে জানে না! আর শিল্পী, কাল প্রাতে অনুচরবর্গ নিয়ে কোতোয়াল আসবে, আলেখ্য রাজপ্রাসাদে স্থানান্তরিত করবার জন্যে—সেজন্যে প্রস্তুত হয়ে থেকো। শিল্পী, তুমি নতুন বেগমের ছবি আঁক নি, দ্বিতীয় নতুন বেগমের সৃষ্টি করেছ।"

বাদশা ও উজির মতিমঞ্জিল ত্যাগ করলেন।

ওঃ প্রলয়! মুহূর্ত্তের মধ্যে শিল্পীর পায়ের নীচেকার কক্ষতল প্রলয় ঘূর্ণনে ঘুরতে লাগল! কক্ষের আসবাব সব তার চোখের সুমুখে যেন মত্ত হ'য়ে নাচতে লাগল, চারিদিকের দেয়াল যেন দুলতে লাগল, দীপদানে দীপ যেন মরণাহত মানুষের হাসির মত বীভৎস হ'য়ে উঠল, শিল্পী টল্‌তে টল্‌তে চিত্রপটের সামনে মেঝের উপরে বসে পড়ল!

স্বপ্ন! স্বপ্ন! সব স্বপ্ন—আপনার চারিদিকে স্বপ্নের জাল বুনে এতদিন কি প্রবঞ্চনার মাঝেই না সে এই ছ'মাস কাটিয়েছে!—কোথায় সে? কে সে!—মিথ্যা—মিথ্যা—সব মিথ্যা। তার চাইতে অনেক বেশি সত্যি, লক্ষ কোটী গুণ সত্যি, ভয়ঙ্কররূপে সত্যি এই ইরাণ-তুরাণ, ইরাণ-তুরাণের বাদশা হুশেন শাহ্, হুশেন শাহের হারেম, আর সেই হারেমে বন্দিনী নতুন বেগম—সত্যি সত্যি, ওগো অতি সত্যি, নিষ্ঠুর ভাবে সত্যি, নির্ম্মম ভাবে সত্যি, মৃত্যুর মত সত্যি!

সেই হুশেন শাহের রাজপ্রাসাদে এই আলেখ্য স্থানান্তরিত হবে কাল—একটি মাত্র রজনীর অবসানে। এই আলেখ্য, যে আলেখ্যের প্রতি অণুতে অণুতে তার অস্তিত্ব বিছিয়ে আছে, যে আলেখ্য মাসে মাসে দিনে দিনে নিমেষে নিমেষে আপনার প্রত্যেক চিন্তাটি দিয়ে, প্রত্যেক বিশ্বাসটি দিয়ে, প্রত্যেক ইচ্ছাটি দিয়ে, প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষাটি

দিয়ে, সে জাগিয়ে তুলেছে—তাই একজনের একটি মাত্র কথায় চির-দিনের জন্যে তার কাছ থেকে অপসারিত হবে। বাদশার আম-দরবারে এই আলেখ্য ঝুলবে, লক্ষ লোকের চোখের তৃপ্তির জন্যে—তার জন্যে রইবে শুধু লক্ষ কণ্ঠে অজস্র বাহবা। শিরা হ'তে বিন্দু বিন্দু করে' রক্ত চুইয়ে বাহবা লাভ! না—না—চাই নে বাহবা, চাইনে লক্ষ দশ লক্ষ কোটী লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা, আমায় ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও কেবল এই আলেখ্যখানা!

বাতুল—বাতুল, এই আলেখ্য? ওরে শিল্পী, ওরে মূর্খ মৌকুল, কোথায় তোর মানসী কোথায়? এই আলেখ্য? তোর মানসী যে প্রত্যেক নিমেষটিতে বাদশা হুশেন শাহের অন্তঃপুরবাসিনী, সূর্য্যের আলোর পর্য্যন্ত যার মুখ দেখবার অধিকার নেই, এই আলেখ্য? জড়—জড়—কেবল রঙ আর রঙ আর রঙ—জড়—জড়—অতি জড়। জড়? না—না—কে বললে জড়। ওরে নাস্তিক—ঐ যে, ঐ যে বুক দুলছে না কি? ঐ যে চোখের পাতায় অশ্রুবিন্দু কাঁপছে, ঐ যে ঠোঁট দুখানি পাংশু হ'য়ে উঠল—জড়? নয়—নয় কিছুতেই নয়—ঐ যে দীর্ঘ নিশ্বাসে বুক দমে গেল—ঐ যে ঘাঘরার প্রান্তটা কেঁপে উঠল না কি? পাগল—পাগল—এ যে একেবারেই জড়—শক্তিহীন, গতিহীন, ইচ্ছাহীন!

শিল্পী উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সেই কক্ষতলে বসে আলেখ্যের দিকে অনিমেষ চোখে চেয়ে রইল। ঐ ঠোঁট দুখানি যদি একবার—কেবল একবার মাত্র নড়ে' ওঠে, একবার মাত্র ডাকে—"শিল্পী"। ঐ চোখের তারা দুটি যদি কেবল একটিমাত্র নিমেষের জন্যে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, যদি—যদি—যদি—আঃ কি নিষ্ঠুর শাণিত তরবারির একটুকু স্পর্শে

তার সূক্ষ্ম কোমল স্বপ্নের জাল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল, হাওয়ায় মিশিয়ে গেল। শিল্পী নিস্তব্ধ হ'য়ে বসেই রইল—দণ্ডের পর দণ্ড কেটে যেতে লাগল, সন্ধ্যার আঁধার ধীরে ধীরে নিবিড় কালো হ'য়ে উঠল, মতিমঞ্জিলের বৃক্ষে বৃক্ষে পাখীর ডাক সব নীরব হ'য়ে গেল, দণ্ডে দণ্ডে প্রহর কাটতে লাগল, শিল্পী ক্লান্ত দেহ মন নিয়ে ধীরে ধীরে কখন্ নিদ্রাভিভূত হ'য়ে গালিচার উপরে টলে পড়ল তা জানলও না।

* * * *

এদিকে মধ্যরজনীর নীরবতাকে মুখরতায় ভরিয়ে দিয়ে বাদশা হুশেন শাহ্‌র হারেমে মহা উৎসব চল্‌ছে। সহস্র দীপালোকে রাত্রির অন্ধকার দূর করছে, অথচ তা দিনের একান্ত স্পষ্টতায় কোন দিকেই সমাপ্তি টানে নি—সবই যেমন রহস্যময়, আভাসময়, ইঙ্গিতময়। বেলোয়ারী ঝাড়ের ঠুন্‌টান্, বলয় কঙ্কনের ঠিনি ঠিনি, নূপুর নিক্কনের রিনি-ঝিনি। কত কত রূপসী তরুণী হীরে মণি মুক্তা জহরতে ভূষিত। প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালনে দীপ-রশ্মিস্পর্শে তাদের আর সারা দেহ হ'তে যেন তারার টুক্‌রো ছিটিয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। তাদের নিবিড় কালো আঁখিতারা হ'তে অবিরাম ক্ষরিত হচ্ছে অমৃত ও হলাহল, জীবন ও মৃত্যু—ঐ যে দেখা যায় তাদের আবেশবিহ্বল আঁখি পাতে পাতে অঙ্কিত অমরার সিংহাসন আর গভীর গহন রসাতলের বিরাট গহ্বর।

অসংখ্য তরুণী রূপসী তাদের রূপের ডালি নিয়ে, চটুল চাহনি নিয়ে, হাসির তরঙ্গ তুলে, উঠছে, বসছে, ঘুরছে, ফিরছে, চলছে। এই তরুণীদের মেলার মধ্যে বৃদ্ধ হুশেন শাহ্।

কি নিষ্ঠুর উৎসব! কি নির্ম্মম এই অসংখ্য তরুণীদের একটি বৃদ্ধকে ঘিরে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সাধ আহ্লাদের 'সমাপ্তি! না জানি ঐ চটুল চাহনীর পিছনে কত শত দীর্ঘ নিশ্বাস সংগোপিত, ঐ হাল্‌কা হাসির পশ্চাতে কত কত হতাশার গুরুভার অটুট, কত কত জীবনের ব্যর্থতা, ঐ উৎসব রজনীর পশ্চাতে আপনার কড়া ক্রান্তির হিসেব টেনে চলেছে! প্রবল প্রতাপশালী হুশেন শাহ্, ঐ বিরাট ব্যর্থতার বিনিময়ে কিছু দান করবার ক্ষমতা তোমার হাতে নেই

নতুন বেগম গান গাচ্ছিল—কি করুণ কি কোমল সে সুর! যেন তার আঁখির পাতে বিশ্বের অশ্রুরাশি থম্‌কে যাচ্ছে, যেন তার ঠোঁটের কোণে সারা জগতের বিষাদ গুম্‌রে মরছে, আর তার কণ্ঠস্বরে কি মিষ্টি বীণার তানেই অশ্রুসাগর উথলে উঠছে!

"ওগো অচেনা, তুমি এমনি পরিচিত—এতদিন তবে কোথায় ছিলে? যখন প্রথম বুল্‌বুল্ ডেকেছিল, যখন প্রথম সিরাজির স্পর্শ স্নায়ুতে স্নায়ুতে চারিয়ে গিয়েছিল, যেদিন প্রথম দিগন্তের কোণে কোণে চোখ দুটি তোমার সন্ধানে ফিরছিল, সেদিন তুমি কোথায় ছিলে—কোথায় ছিলে?—"

"বুল্‌বুল্‌কে খাঁচায় পুরে দিলে, সিরাজি জহরত-মণ্ডিত পিয়ালায় রক্ষিত হ'ল, চোখের সাম্‌নে আঁধার নেমে এল, অচেনা তুমি আজ কেমন করে' কোথায় থেকে এলে?—"

"ওগো পরিচিত—কেবলই জল ঝরবে, মেঘ থেকে কেবলই জল ঝরবে, জোছনা আর খেলবে না, ফুল আর ফুটবে না, বুল্‌বুল্ আর ডাকবে না, ওগো তুমি চির-পরিচিত—

"ওঃ"—গান আর শেষ হ'ল না। সহসা নতুন বেগম দু-হাতে বুক চেপে গালিচার উপরে লুটিয়ে পড়ল, তার মুখ পাংশুবর্ণ হ'য়ে গেছে, চোখের তড়িৎ মলিন হয়ে গেছে।

বাদশা হুশেন শাহ্ চক্ষের পলকে এসে লুণ্ঠিতা নতুন বেগমের পার্শ্বে নতজানু হ'য়ে বসলেন—দেখলেন নতুন বেগম অতি কষ্টে নিশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে। বাদশা শঙ্কিত কণ্ঠে ডাকলেন—"পিয়ারী, পিয়ারী—"

হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে অতি কষ্টে নতুন বেগম উত্তর দিলে—"জাঁহাপনা, বাঁদীর পোস্তাকি মাপ করবেন। বুকের ভিতরটা হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন কে চেপে চেপে ধরছে—" বেগমের শ্বাস ফুরিয়ে এল, আর কিছু ফুটল না।

তৎক্ষণাৎ বাঁদীরা ধরাধরি করে' নতুন বেগমকে কক্ষান্তরে নিয়ে গেল, শয্যায় শায়িত করে' দিলে, প্রতি মুহূর্ত্তে তার শ্বাসকষ্ট উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হ'তে লাগল। হাকিমের জন্যে লোক প্রেরিত হল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নতুন বেগমের যেন নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টের কতকটা উপশম হ'ল, তার মুখ থেকে ধীরে ধীরে যন্ত্রণার চিহ্ন দূরীভূত হ'য়ে গেল, শান্তির নিশ্বাস ফেলে নতুন বেগম ধীরে ধীরে চোখ দুটি নিমীলিত করল, ধীরে ধীরে তার রঙিন্ ঠোঁটে রঙিনতর একটা হাসির রেখা অঙ্কিত হ'য়ে গেল।

হাকিম এলেন, নিদ্রিতা নতুন বেগমের নাড়ী স্পর্শ করলেন, একটা বিস্ময়ের ক্ষণিক আভা তাঁর চোখ দুটোতে খেলে গেল, আত্মসম্বরণ করে' তিনি আবার দ্বিগুণ মনোযোগের সঙ্গে নাড়ী অনুভব করলেন, তারপর ধীরে ধীরে হাতখানিকে শয্যায় নামিয়ে রাখলেন। গম্ভীর কণ্ঠে

হুশেন শাহের দিকে ফিরে বললেন—"ইরাণ-তুরাণের প্রবল পরাক্রান্ত বাদশা জাঁহাপনা, নতুন বেগম এ নশ্বর জগত ত্যাগ করে' বেহেস্তের পথে যাত্রা করেছেন।"

বাদশার মুখ দিয়ে কথা সরল না।

* * * *

শিল্পী স্বপ্ন দেখছিল। হিমাদ্রির কোন্ গহন গভীর নির্জ্জন গুহায় একমনে সে আপনার মানসীর ছবি আঁকছিল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর সে অনাহারে অনিদ্রায় ছবি আঁকছিল। সহস্র বৎসর পরে তার ছবি আঁকা শেষ হ'ল। তখন শিল্পী সভয়ে দেখলে, এ ত আর কেউ নয়—এ যে নতুন বেগম। দেখতে দেখতে গিরিগুহা পরিবর্ত্তিত হ'য়ে মতিমঞ্জিল হ'য়ে গেল। হতাশায় শিল্পী তার অঙ্কিত আলেখ্যের সাম্নে লুটিয়ে পড়ল।

সহসা শিল্পী দেখলে ছবিতে আঁকা ওড়না যেন একটু কেঁপে উঠল, আলেখ্যের চোখের পাতা মিট্‌মিট্ করে' উঠল, চোখের তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল, ধীরে ধীরে আঁকা মানসী-মূর্ত্তি চিত্রপট থেকে কক্ষতলে নেমে পড়ল, তার কানে এসে বাজল—"শিল্পী—"

শিল্পী ঘুম থেকে চমকে উঠল, জেগে দেখলে, তার সাম্নে দাঁড়িয়ে এক তরুণী স্তিমিত থেকে তার মুখ দেখলে, ভয়ে বিস্ময়ে তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল—"নতুন বেগম!"

স্বপ্নময়ী বললে—"শিল্পী, নতুন বেগম মরেছে, আমি তোমার প্রণয়িনী, এস—রাত আর বেশি নেই—"

নিমেষে শিল্পীর ঘুমের ঘোর কেটে গেল—তার দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু জাগ্রত হ'য়ে উঠল, তার শিরায় শিরায় তড়িৎ চারিয়ে গেল। এত স্বপ্ন নয়—এ যে সত্যি—অতি সত্যি। তৎক্ষণাৎ তরুণ যুবক উঠে দাঁড়াল, তরুণীর হাত ধরে' বাইরে বেরিয়ে এলো। রজনীর শেষ শুকতারা পূব গগনে জ্বল্-জ্বল্ করছিল। সেই শুকতারার আলোকে আলোকে প্রেমিক প্রেমিকা হাত ধরাধরি করে' দূর দিগন্তে কোথায় মিশিয়ে গেল।

(৬)

মানুষের হাজার শোক হোক্ রাজার রাজকার্য্য বন্ধ থাকে না। পরদিন বাদশা হুশেন শাহ্ কোতোয়ালকে মতিমঞ্জিল থেকে নতুন বেগমের তস্‌বীর আনবার জন্য পাঠালেন। কোতোয়াল অনুচরবর্গ নিয়ে মতিমঞ্জিল উদ্দেশ্যে চললেন। যথাসময়ে ফিরে এসে বাদশা-সমীপে নিবেদন করলেন—"জাঁহাপনা, মতিমঞ্জিলে শিল্পীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না।"

বাদশা বিস্মিত হলেন, উজিরকে সঙ্গে নিয়ে মতিমঞ্জিল উদ্দেশে যাত্রা করলেন। এসে দেখলেন শিল্পী অদৃশ্য। শিল্পী যে কক্ষে ছবি আঁকছিল সেই কক্ষে দুজনে প্রবেশ করলেন। দেখলেন কেউ কোথাও নেই। আপনার স্থানে পরদা-ঢাকা চিত্রপট—তার দুপাশে রজতাধারে তৈলহীন প্রদীপ দুটিতে সল্‌তের ভস্মাবশেষ।

বাদশা চিত্রপট দেখে হৃষ্ট হলেন। বললেন—"উজির, চিত্রকর না থাক, চিত্রপট রয়েছে—তাই আমাদের যথেষ্ট। চিত্রকর যদি

পুরস্কার প্রত্যাশা না করে সে দোষ ইরাণ-তুরাণের বাদশার নয়—” বলতে বলতে তিনি চিত্রপটের পরদা অপসারিত করলেন।

বাদশার মুখের কথা মুখেই মিলিয়ে গেল। দু'জনে মন্ত্র-মুগ্ধের মত ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন। চিত্রপটে রত্নখচিত সিংহাসন যেমন আঁকা ছিল তেমনি আছে; কিন্তু তার উপরকার নতুন বেগমের চিহ্নমাত্র নেই।

রত্নসিংহাসনের রত্নগুলো যেন প্রাণ পেয়ে জ্বল্ জ্বল্ করছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

অভিভাষণ।*

—:০:—

এই রঙ্গপুর সহরে আমি পূর্ব্বে একবার আসি সভাপতির আসন ত্যাগ করতে, সেই সহরে আমাকে যে আর একবার আসতে হবে সভাপতির আসন গ্রহণ করতে, একথা সেদিন আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।

আজ থেকে চার বৎসর পূর্ব্বে, যে সভায় নূতন সভাপতিকে বরণ করে নেবার জন্য আমাকে রঙ্গপুরে উপস্থিত হতে হয়েছিল, সে সভার আলোচ্য বিষয় ছিল সাহিত্য। অপরপক্ষে আজকের সভার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, ইংরাজিতে যাকে বলে পলিটিক্স। আমি “রাজনীতি”র পরিবর্ত্তে পলিটিক্স শব্দ ব্যবহার করছি এই কারণে যে, পলিটিক্স বলতে শুধু রাজার নয়, প্রজার কথাও বোঝায়। আর যতদূর জানি, এ সভার কর্ত্তাব্যক্তিদের ইচ্ছা যে, আজ রাজার অবিচারের ও রাজার অত্যাচারের কথাটা মুলতবি রেখে, প্রজার অধিকারের ও প্রজার কর্ত্তব্যের বিষয়ই আলোচনা করা হয়।

আমি এই বলে সুরু করেছি যে, একদিন আমাকে এরূপ সভার যে নায়ক হতে হবে, একথা সেদিন আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। এর কারণ দেশের কোনো সম্প্রদায় যে আমাকে পলিটিক্সের কোনো আসরে টেনে

* উত্তর-বঙ্গ রায়ত কন্‌ফারেন্সের রঙ্গপুর অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ। সঃ সঃ

নামাবেন, এবং সেই সঙ্গে সে আসরের মূল-গায়েন করবেন, এ দুরাশা সেকালে আমার মনে স্থান পায় নি।

পলিটিসিয়ানরা জানতেন যে আমি লিখি ছোট গল্প, আর তার চাইতেও ছোট, অর্থাৎ—চৌদ্দপেয়ে কবিতা, আর সেই সঙ্গে লিখি বড় বড় প্রবন্ধ। সে সব প্রবন্ধ এত লম্বা যে, তা পড়বার অবসর কাজের লোকের নেই, ধৈর্য্য বাজে লোকের নেই, উপরন্তু সে সব প্রবন্ধের ভাষা এত সহজ যে, পণ্ডিত লোকের পক্ষে তা বোঝা অসম্ভব। এই সব লেখাপড়ার ফলে, এ খ্যাতিও আমি অর্জ্জন করি যে, পলিটিক্স সম্বন্ধে আমি নির্লিপ্ত ও উদাসীন। মনের দেশে এই বিপথে যাওয়ার দরুণ, বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে অনেকে আমার উপর ব্যাজারও হয়েছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস যে, আমি যদি বাঙলায় সাহিত্য রচনা করবার বৃথা চেষ্টা না করে ইংরাজিতে পলিটিক্স লিখতুম, তাহলে একটা কাজের মত কাজ করতে পারতুম। ছেলেবেলায় গল্প শুনেছি যে, একটি জেলেনি জনৈক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে দেখে দুঃখ করে বলেছিল যে, "হায়! এত বড় জোয়ানটা পুঁথি পড়ে সারা হল, মাছ ধরলে কাজে লাগত"। অনেকের ধারণা যে, আমিও পুঁথি পড়ে সারা হয়েছি; এ অনুমান সত্য হোক আর না হোক, একথা সত্য যে, পলিটিক্সের বহতা জলে আর পাঁচ জনের মত আমিও বহুবার নেমেছি—তবে সেখানে কখনো মাছ ধরতে চেষ্টা করি নি।

এই সব কারণে আপনারা আমাকে আজ যে আসন দিয়েছেন, তাতে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি। কথা কওয়া যাদের জীবনের প্রধান কাজ, অনুকূল শ্রোতালাভের বাড়া সৌভাগ্য তাদের আর কি হতে পারে!

(২)

আপনাদের নিমন্ত্রণ আমি সাদরে গ্রহণ করলেও, স্বচ্ছন্দ চিত্তে করি নি। সত্য কথা বলতে গেলে, এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে অবধি আমার মনে সোয়াস্তি নেই। কেন যে নেই, তার কারণ আপনাদের কাছে নিবেদন করছি।

প্রথমত, আমি জানি যে, এ রকম সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করবার আমি ঠিক যোগ্যপাত্র নই। বক্তৃতা করা আমার ব্যবসায় নয়। এ বিষয়ে কৃতিত্ব লাভ করবার পক্ষে আমার স্বভাব ও অভ্যাস দুইই প্রতিকূল। কথকতা করবার জন্য ভগবদ্দত্ত গলা থাকা চাই—তা সে কথকতার বিষয় মহাভারতই হোক আর নব-ভারতই হোক। ভগবান আমাকে কথকের গলা দেন নি। তারপর স্বভাবের ত্রুটি আমি অভ্যাসের বলে শুধরে নিতে চেষ্টা করি নি। বক্তৃতার আসরে আমি কস্মিনকালেও গলা সাধি নি। লেখককে বক্তার উচ্চ মঞ্চে দাঁড় করানো, বৈঠকী গাইয়েকে নগর সংকীর্ত্তনে যোগ দেওয়ানোর সামিল। যে গলা দু'-চার জনকে শোনাবার জন্য তৈরি করা হয়েছে, সে গলা দু'-চার হাজার লোককে কি করে শোনানো যায়? এ প্রভেদ শুধু স্বরের নয়—সুরেরও। লেখকেরা তাঁদের ভাষা যতদূর সম্ভব মোলায়েম করতে চান, সুরেলা করতে চান তার উপর যদি পারেন ত মাঝে মাঝে এত মৃদু মীড় লাগান, যা সকলের শ্রুতিগোচর হয় না। অতএব এ জাতের লোকের পক্ষে তারায় গলা চড়িয়ে সেই পঞ্চম সুর ধরা অসম্ভব, যা শুনে লোকের দশা ধরবে। আর সে বক্তৃতা করায় লাভ কি যা শুনে মানুষ ক্ষেপে না ওঠে? আমি কিন্তু আমার ক্ষমতার সীমা জানি। অনেককে ক্ষেপানো ত দূরের কথা, কাউকেও

আমি প্রাণপণ চেষ্টাতেও উত্তেজিত করে তুলতে পারি নে। বরং অনেকে বলেন যে, আমার কথা তাঁদের জ্বলন্ত উৎসাহে বরফ জল ঢেলে দেয়। কথা আমি অভ্যেস করেছি, ধীরভাবে—বলতে ধীরভাবে নয়, স্পষ্টকরে জড়িয়ে নয়, সংক্ষিপ্ত করে ফলাও করে নয়, সাদাভাবে রঙ চড়িয়ে নয়, শ্রোতার বন্ধু হিসেবে, গুরু হিসেবে নয়। তা ছাড়া আমার কথার আর একটি গুণ অথবা দোষ আছে, যা—লোক মাতানোর পক্ষে প্রতিকূল। লোকে বলে আমার গল্প ও কবিতার মধ্যে পলিটিক্‌সের ভেজাল আছে। হয়ত তা আছে, কিন্তু এ সত্য সর্ব্বলোক বিদিত যে আমার পলিটিক্সের গায়ে কবিত্ব ও উপন্যাসের গন্ধমাত্রও নেই। অতএব আমার মতামত প্রচারের যোগ্য নয়, বিচারের যোগ্য।

(৩)

কিন্তু আসলে যা নিয়ে আমি সঙ্কটে পড়েছি, সে হচ্ছে ভাষা। পূর্ব্ব হতে শুনে আসছি যে, এ সভায় এমন বহুলোক উপস্থিত থাকবে যারা ইংরাজি জানে না। আমার কথা তারা বুঝবে কি না—সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। আমি অবশ্য বাঙলা বলছি কিন্তু এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাঙলা অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের জানা-ভাষা নয়।—আমরা কই বাঙলা কথা কিন্তু তার মানে হয় ইংরাজি নয় সংস্কৃত। আমাদের জ্ঞান না হতে আমাদের শিক্ষা সুরু হয় আর অর্দ্ধেক জীবন শেষ না হতে সে শিক্ষার শেষ হয় না। জীবনের এই অর্দ্ধেক দিন আমরা শিক্ষা লাভ করি, একদিকে ইংরাজি ভাষা ও ইংরাজি শাস্ত্রে আর একদিকে সংস্কৃত ভাষা

ও সংস্কৃত শাস্ত্রে। এ শিক্ষার ভিতর অবশ্য ইংরাজির ভাগ পোনেরো আনা আর সংস্কৃতের খাদ এক আনা। ফলে আমাদের মনোভাব প্রায় সবই ইংরাজি। কাজেই আমরা যখন বাঙলা বলি কিম্বা লিখি তখন আমরা জ্ঞাতসারে হোক অজ্ঞাতসারে হোক, ইংরাজিরই তরজমা করি। আমাদের মধ্যে ভাষার বিষয় যাঁরা সতর্ক, তাঁরা কথায় কথায় ইংরাজি ভাষার অনুবাদ না করলেও, কথায় কথায় ইংরাজি ভাবের অনুসরণ করেন, আমাদের বাঙলার পুরো অর্থ শুধু তাঁরাই বুঝতে পারেন, যাঁদের ইংরাজি ভাষা ইংরাজি শাস্ত্রের সঙ্গে সম্যক পরিচয় আছে।

সকল দেশেই, যুগ বিশেষে, নতুন ভাব নতুন জ্ঞান প্রথমে উচ্চশ্রেণীর লোকের মনে হয় জন্মলাভ নয় স্থানলাভ করে। তার পরে সেই নতুন জ্ঞান নতুন ভাব কালক্রমে সমগ্র জাতির মনে চারিয়ে যায়। যে সব মনোভাব নিয়ে আমরা লেখাপড়ার কারবার করি, সে সকল যে অদ্যাবধি সর্ব্ব-সাধারণের সম্পত্তি হয়ে ওঠে নি তার কারণ ও-সকল ভাব আমাদের মনেও এখনো পুরো বসে যায় নি। আমাদের নবলব্ধ জ্ঞান হয় অতি দূরদেশের, নয়, অতি দূরকালের সামগ্রী। তার পর সে জ্ঞানও আমাদের আয়ত্ব করতে হয় একটি বিদেশী ভাষা, নয় একটি মৃতভাষার সাহায্যে। এ শিক্ষার ফলে আমাদের মুখের কথা—পুরোপুরি আমাদের মনের কথা হয়ে ওঠে না। যে বস্তু আমাদের সম্পূর্ণ আপনার হয়ে ওঠে নি, তা আমরা পরকে দান করব কি করে?

তা ছাড়া—এ শিক্ষা আমাদের মনের দেশে একটি নূতন উপদ্রবের সৃষ্টি করেছে। সংস্কৃত শাস্ত্রের সঙ্গে বিলেতি শাস্ত্রের মিল ত নেই-ই বরং অনেক ক্ষেত্রে ঘোরতর বিরোধ আছে। ফলে আমাদের মনে সেকেলে ও একেলে, দেশী ও বিলেতি ভাবের ঠেলাঠেলি গুতোগুতি

চলছে। আমরা ঠিক করে উঠতে পারি নে, এ দু পক্ষের ভিতর কোন্ পক্ষের জয় হওয়া উচিত, উভয়ের মিলন করাও আমাদের পক্ষে এক রকম অসম্ভব। এ অবস্থায় মনের শান্তির জন্য আমরা আমাদের মনকে এ দু-পক্ষের ভিতর ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছি। মনের যে ভাগের ইহলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ, সে অংশ এখন ইংরাজির দখলে আর যে ভাগের পরলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ, সে অংশ সংস্কৃতের দখলে। এ পৃথিবীতে বেঁচেবর্ত্তে থাকবার জন্য, বড় হবার জন্য, মানুষ হবার জন্য, যে সব বিষয়ের দরকার, সে বিষয়ে আমরা যখন কথা বলি, তখন সে সকল কথার মানে দেখতে হয়, ইংরাজি সাহিত্যে, আর মৃত্যুর পর আমাদের আত্মার কি গতি হবে, সে বিষয়ে আমরা যখন কথা কই, তখন সে কথার মানে দেখতে হয় সংস্কৃত শাস্ত্রে।

রাজনীতি অর্থনীতি, শিল্প বাণিজ্য, এমন কি স্বদেশ, স্বজাতি, স্বরাজ্য প্রভৃতি শব্দ আমাদের কানে আসামাত্র তার ইংরাজি অর্থ আমাদের মনে উদয় হয়, যে অর্থ অশিক্ষিত লোকের জানা নেই। অপর পক্ষে আমরা যখন মৃত্যুর অপর পারে লভ্য সালোক্য, সাযুজ্য, কৈবল্য, নির্ব্বাণ মোক্ষ প্রভৃতি কথা উচ্চারণ করি, তখন আমাদের মনশ্চক্ষুর সুমুখে এসে দাঁড়ায় সংস্কৃত দর্শন। স্বর্গ আর এখন আমাদের মাথার উপরে নেই, নরকও পায়ের নীচে নেই। যদি কেউ বলেন—ও-দুটি গেল কোথায়, তার উত্তর—আমাদের বিশ্বাস ঐ দু'য়ে মিলেমিশে যা সৃষ্টি হয়েছে, তারি নাম দুনিয়া।

আমি একদিন একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ লাভ করে যুগপৎ অবাক ও নির্ব্বাক হয়ে যাই। তাঁর সর্ব্বাঙ্গে ছিল ইংরাজি সাজ, পায়ে বুট, পরণে পেণ্টলুন, গায়ে বুকভাঙ্গা কোট, গলায় ফিতে-

বাঁধা কলার, মাথায় হ্যাট; কিন্তু তাঁর কপালে প্যাটপ্যাট করছিল, আধুলী প্রমাণ একটি হোমের ফোঁটা, আর তাঁর হ্যাটের নীচে থেকে উঁকি মারছিল বিঘৎ প্রমাণ একটি টিকি। তাঁকে দেখবামাত্র আমার মনে হল, এই মূর্ত্তিটিই হচ্ছে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের প্রতিমূর্ত্তি। বলাবাহুল্য যে, অশিক্ষিত ভারতবাসীর মনের এ চেহারা নয়—সে মূর্ত্তি হচ্ছে অর্দ্ধনগ্ন।

এ বিষয়ে এত কথা বলবার আমার উদ্দেশ্য, এই সত্যটি খাড়া করা যে, এই শিক্ষার প্রসাদে আমাদের মধ্যে একটা নতুন জাতি-ভেদের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষিত বাঙালী একজাত, অশিক্ষিত বাঙালী আলাদা। এ দুয়ের মনের ভিতর কোনরূপ জ্ঞাতিত্ব কিম্বা কুটুম্বিতা নেই, যে জ্ঞাতিত্ব যে কুটুম্বিতা ইংরাজ আসবার পূর্ব্বে এদেশে উচ্চ-নীচ সকলের ভিতর ছিল। আজ থেকে একশ' বছর আগে আমাদের পরস্পরের শিক্ষা দীক্ষার ভিতর এমন কোন প্রভেদ ছিল না যে, আমাদের প্রপিতামহদের কথা তোমাদের প্রপিতামহেরা বুঝতে পারতেন না। সেকালে উচ্চ শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের ভিতর অবস্থার যাই ইতর বিশেষ থাকুক, পরস্পরের মনের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। মানুষের আশা আশঙ্কা, ভয় ভাবনা, হিতাহিত জ্ঞান, ধর্ম্ম কর্ম্ম—এ সব বিষয়ের মতামত সেকালে উচ্চ নীচ সকল লোকের এজমালী সম্পত্তি ছিল। আর আজকের দিনে আমাদের মন বিলেতি ভাবের আকাশে ঘুড়ির মত খানিকটা উঠে লাট খাচ্ছে অপর পক্ষে জনসাধারণের মন যেখানে ছিল সেখানেও নেই, একমাত্র নিজের অন্নবস্ত্রের চিন্তার মধ্যে ডুবে তলিয়ে গেছে। কেননা তাদের মনকে একমাত্র সাংসারিক ভাবনার উপরে তুলে রাখবার সূত্রটি আজ ছিন্ন

হয়েছে। উচ্চশ্রেণীর লোকের সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর লোকের মনের প্রভেদ আজকের দিনে বাস্তবিকই আকাশ পাতাল। ফলে এদেশে জনসাধারণ বলে যে একটা প্রকাণ্ড সম্প্রদায় আছে সেকথা আমরা একরকম ভুলেই গিয়েছিলুম।

(৪)

আমার এ কথা মোটেই অত্যুক্তি নয়।

ভুলে যে গিয়েছিলুম তার কারণ ভোলবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। যা মনে করে রাখবার প্রয়োজন নেই মানুষে সহজেই তা ভুলে যায়। শুধু শিক্ষায় নয় জীবনেও আমরা নিম্নশ্রেণীর সঙ্গে পৃথক হয়েছি এবং সেও অবস্থার গুণে।

আমরা যে শুধু ইংরাজি শিক্ষিত, তাই নয়—আমরা ইংরাজের হাতে-গড়া সম্প্রদায়, ইংরাজ শাসনের কৃপায় আমাদের উদয় ও আমাদের অভ্যুদয়।

শিক্ষিত সম্প্রদায় ওরফে ভদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরা সকলেই হয় জমিদার নয় হাকিম, হয় উকিল নয় ডাক্তার, হয় স্কুল মাস্টার নয় কেরাণী।

সেকালে এদেশে এ শ্রেণীর লোক যে মোটেই ছিল না তা নয়।

পুঁথির পঠন পাঠন করবার, খাতাপত্র লেখবার, নাড়ী টেপবার ও বড়ি গেলাবার লোক, অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ সেকালেও অবশ্য ছিল। এবং প্রধানত এই তিন জাতের লোকেই আজকের দিনে সমাজের মাথায় উঠেছেন।

সেকালে এঁরা দিন গুজরান করতেন দেশের লোকের আশ্রয়ে, আজকে কল্পেন ইংরাজ-রাজের আশ্রয়ে। সেকালে এ দল সংখ্যায় বড় বেশি ছিল না, তাদের আর্থিক অবস্থাও ঠিক হিংসে করবার মত ছিল না এবং তাদের বিদ্যার বহরটাও খুব খাটো ছিল।

সেকালের তুলনায় একালে আপিস আদালত স্কুল-কলেজ হাঁস-পাতাল ডাক্তারখানা জেল ও থানার সংখ্যা এত অসম্ভব বেড়ে গেছে যে স্বর্গীয় পিতামহেরা একবার যদি দেশে ফেরেন ত এদেশ যে তাঁদের দেশ তা তাঁরা একনজরে ঠাওর করতে পারবেন না।

উপরে যে সকল ক্ষেত্রের উল্লেখ করলুম সে সকল ক্ষেত্রেই মানুষের কাজ হচ্ছে—হয় কথা কওয়া, নয় কলম পেষা।—এক কথায় মস্তিষ্কের কাজ। অবশ্য থানায় ও ডাক্তারখানায় ভদ্র সম্প্রদায়ের কিছু হাতের কাজও আছে কিন্তু তাকে ঠিক শিল্প বলা যায় না।

কিন্তু যেমন ব্যক্তিবিশেষের তেমনি জাতিবিশেষেরও যদি মাথাটা প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে আর সেই সঙ্গে তার হাত পা সব শুকিয়ে যায় তাহলে সেটা কি স্বাস্থ্য কি বল কিছুরই পরিচয় দেয় না। মানুষের দেহের ওরকম অবস্থা দেখলে লোকে বলে তার মাথায় জল হয়েছে অতএব আমাদের সম্বন্ধে কেউ ও-রকম কথা বললে আমরা রাগ করতে পারি কিন্তু তার উপর হাত তুলতে পারি নে কেননা সে হাত আমাদের একরকম নেই বললেই হয়।

ইংরাজের আমলে আমাদের হাত যে শুকিয়ে গিয়েছে তার প্রমাণ যে-সম্প্রদায়ের কাজই হচ্ছে হাতের কাজ, সে সম্প্রদায় একরকম উচ্ছন্নে গেছে। কামার কুমোর তাঁতি ছুতোর যুগী জোলা প্রভৃতি সব কলের তলে চাপা পড়ে পিষে গিয়েছে। শিল্পীর দল এখন আর এদেশে

নেই, আছে ইউরোপে আমেরিকায় জাপানে অষ্ট্রেলিয়ায়। তাঁদের হাতের তৈরি মাল আমাদের জীবনযাত্রার সম্বল। কিন্তু যে দেশে শিল্প আছে সে দেশে একালে শিক্ষার সঙ্গে শিল্পের, মাথার সঙ্গে হাতের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, এর একটির শক্তির সঙ্গে অপরটির শক্তি বাড়ে কিম্বা কমে সুতরাং সে সব দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সমাজ দেহেরই উচ্চাঙ্গ। এদেশে সে উচ্চাঙ্গ ছিন্ন অঙ্গ। আমি যখন একটু দূর থেকে স্ব-সম্প্রদায়কে দেখি, তখন আমি মনে মনে এ কথা না বলে থাকতে পারি নে যে, "কাটা মুণ্ড কথা কয়।" শুধু কথা কয় না, বড় বড় কথা বলে, তাও আবার ইংরেজিতে! এ দেখে যাঁর আনন্দ হয় তিনি ছেলে মানুষ, আমার শুধু হাসি পায়, কিন্তু সে হাসি কান্নারই সামিল।

সে যাই হোক আমাদের সমাজ দেহের একটা প্রধান অঙ্গ যে শুকিয়ে গিয়েছে—এবং তার ফলে আমাদের জাতীয় জীবন যে নিতান্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে এবং জাতীয় জীবনকে সুস্থ ও সবল করতে হলে এদেশে শিল্পের যে পুনর্জন্ম দেওয়া চাই এ কথা ত সর্ব্ববাদী সম্মত। এই মনোভাবেরই ত নাম স্বদেশী!

আজকের সভায় এ বিষয়ের আলোচনা আর তুলব না। কেননা এ সমস্যা যেমন গুরুতর তেমনি জটিল। এর সরল মীমাংসা সরল হতে পারে কিন্তু মীমাংসাই নয়। কারও কাছে এমন সঞ্জীবনী মন্ত্র নেই—যার বলে আমাদের মৃত শিল্পকে এক মুহূর্ত্তে খাড়া করে তুলতে পারা যায়। এ সব মন্ত্রতন্ত্রের কথা নয়, যন্ত্রতন্ত্রের কথা। শিল্পবাণিজ্য বর্ত্তমান যুগে তার স্বদেশী চরিত্র ত্যাগ করে সর্ব্বদেশী হয়ে উঠেছে। শিল্পবাণিজ্যের জালে সমগ্র পৃথিবী আজ এমনি জড়িয়ে পড়েছে যে

ইচ্ছে করলেই তার থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার শক্তি কোন দেশেরই নেই। দেখ না কেন এত বড় ঐশ্বর্য্যশালী ও প্রতাপশালী দেশ ইংলণ্ড অর্দ্ধমৃত জর্ম্মাণী আর অর্দ্ধক্ষিপ্ত রুসিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হবার জন্য কতদূর লালায়িত হয়েছে। ইউরোপের প্রতি দেশের আজ এ জ্ঞান হয়েছে যে এ ক্ষেত্রে কোন দেশকে একঘরে করতে গেলে নিজে একঘরে হয়ে পড়তে হয় এবং তাতে আর যাই হোক, অন্নবস্ত্রের কোন সুসার হয় না। আমাদের শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অবশ্য করতেই হবে, নইলে পৃথিবীর আর সব মহাজন জাতের কাছে আমাদের দেশ রেহানাবদ্ধ হয়ে থাকবে আর তাদের সুদ দিতেই আমরা সর্ব্বস্বান্ত হব। এ যুগের আর্থিক হিসাব এই। যে জাতি মাল ঘরের ও পরের জন্য তৈরি করে, তার স্থান সবার উপরে। যে জাতি মাল কি ঘরের কি পরের কারও জন্যে তৈরি করে না, তার স্থান সবার নীচে। আর যে জাতি মাল শুধু ঘরের কিম্বা শুধু পরের জন্য তৈরি করে, এমন কোনও জাতি যদি থাকে – তার স্থান মাঝে, তার কপালে হয় ওঠা, নয় নামা ছাড়া অন্য গতি নেই। তবে এ সমস্যা আমাদের পক্ষে বিশেষ গুরুতর এই কারণে যে, আমাদের দেশে এমন কিছু শিল্প নেই, যাকে লালন পালন করে আবার আমরা বড় করে তুলতে পারি। এ বস্তু আমাদের নতুন করে গড়তে হবে—তার জন্য বহু ভাবনা চিন্তা চাই—বহু পরিশ্রম চাই, অটল ধৈর্য্য চাই, একাগ্র সাধনা চাই। যদি কেউ মনে করেন যে, তিনি শুধু সভায় বক্তৃতা করে ও কাগজে আর্টিকেল লিখে আমাদের লুপ্ত শিল্পকে উদ্ধার করবেন, তাহলে আমি বলি, তিনি কলেরও বল জানেন না, ধনেরও বল জানেন না। বর্ত্তমানে দুটি ধাতু পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব

করছে, সোনা আর রূপো। যে জাত এ দুই ভূতকে আমলে না আনতে পারবে, সে জাত পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাবে। আর এ দুটিকে সত্য সত্যই দখলে আনতে হলে, চাই প্রবুদ্ধ জ্ঞান আর প্রকৃষ্ট কর্ম্ম। আমরা যে মনে করি যে, এ লড়াই আমরা কথায় ফতে করব, তার কারণ আমরা জানি শুধু বক্তৃতা করতে আর কলম পিষতে। উপরে যা বললুম তার থেকে এ অনুমান করবেন না যে, শিল্প-বাণিজ্য নিয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বলা কওয়ার কোনই সার্থকতা নেই। তা যদি মনে করতুম, তাহলে আমি এ সভায় উপস্থিত হতুম না, কেননা একমাত্র কথা কথা কওয়া ব্যতীত অপর কোন শক্তি আমার নেই।

এই সব আলোচনার প্রথম ফল এই যে, আমাদের জাতীয় দৈন্যের বিষয়ে আমরা যখন সচেতন হই, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, আমরা কি মহা সঙ্কটে পড়েছি।

এর দ্বিতীয় ফল এই যে, আমাদের জীবন সমস্যাটা যে কত ভীষণ, সে বিষয়ে আমাদের চোখ ফোটে। আর যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন বিপদ চোখে পড়লেই তা অর্দ্ধেক কেটে যায়।

(৫)

দেশের জনসাধারণের সঙ্গে আমরা যে পৃথক হয়ে পড়েছি,—দেশের লোকের মনের ও জীবনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যে অতি দূর হয়ে পড়েছে, এই কথাটা সকলকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য আমি "রায়তের কথা" লিখি; কেননা নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যা কিছু যোগাযোগ আছে, সে একমাত্র জমিসূত্রে। আগে যে লিখি নি, তার কারণ ও-কথা দু-বছর আগে বললে তা'তে বড় কেউ কান

দিত না। আজকের দিনে সকলে দিতে বাধ্য, কারণ জনসাধারণকে হঠাৎ আমাদের পলিটিক্সের আখড়ায় টেনে আনা হয়েছে।

আজকের দিনে সবারই মুখে একটি কথা নিত্য শোনা যায়, সে কথা হচ্ছে ডিমোক্রাসি। এই ইংরেজি কথাটার নানারূপ সংস্কৃত অনুবাদ করা হয়েছে যথা—প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র, জনতন্ত্র, স্বায়ত্বশাসন, লোকায়ত্ত শাসন ইত্যাদি। সাদা বাঙলায় ডিমোক্রাসির মানে হচ্ছে রাজ্যের সেই শাসন-প্রণালী, যার গোড়ায় আছে লোকমত। একথা বলাই বেশি যে, লোকমত জানতে হলে লোকের কাছে যাওয়া দরকার, তাদের সুখ দুঃখ তাদের অভাব অভিযোগের সন্ধান নেওয়া প্রয়োজন। আমি যদি ভোটের জন্য তোমাদের দ্বারস্থ হই, তাহলে তোমরা আমাকে অবশ্য জিজ্ঞাসা করবে, আমি বাঙলার মন্ত্রীসভায় বসলে, আমার দ্বারা তোমাদের কি দুঃখ দূর হওয়া সম্ভব। এর জবাব আমাকে দিতেই হবে, এবং সে জবাব আমার পক্ষে দেওয়া অসম্ভব, যদি না আমি জানি তোমাদের ব্যথা কোথায়। এর থেকে আমি ধরে নিয়েছি যে, আজকের দিনে শিক্ষিত সম্প্রদায় "রায়তের কথা"য় কান দেবেন। এ ধরে নেওয়াটা আমার পক্ষে যে ভুল হয় নি তার প্রমাণ, আমার জবানী রায়তের কথা শুনে শিক্ষিত সম্প্রদায় ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। অনেকেই আমার মতে সায় দিয়েছেন, যাঁরা দেন নি তাঁরা চুপ করে আছেন। অবশ্য আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, অর্থাৎ—একদল পলিটিসিয়ান আছেন, যাঁরা শুনতে পাই, আমার উপর ঈষৎ নারাজ হয়েছেন। তাঁদের মতে আমার কথাটা ঠিক; কিন্তু এ সময়ে তা তোলাটা বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি। তাঁরা নাকি আমার ঐ লেখার দরুণ উভয় সঙ্কটে পড়েছেন, একপক্ষে জমিদার, অপর

পক্ষে রায়ত, এদের মধ্যে কার মন রেখে চলবেন, তা তাঁরা ঠিক বুঝতে পারছেন না। যেহেতু তাঁরা পেট্রিয়ট, সে কারণ তাঁরা রায়তের পক্ষে, আর যেহেতু তাঁরা পলিটিসিয়ান, সে কারণ তাঁরা জমিদারের পক্ষে। এর উত্তরে আমার নিবেদন এই যে, পেট্রিয়টিজম ও পলিটিক্সের এই বিচ্ছেদটা যত শীগ্‌গির মিলনে পরিণত হয়, ততই দেশের মঙ্গল।

পেট্রিয়টিজম ও পলিটিক্সের, দেশভক্তি ও রাজনীতির এই বিচ্ছেদটা কাল্পনিক নয়। পেট্রিয়টিজম হচ্ছে একটা মনের ভাব আর পলিটিক্স হচ্ছে একটা বৈষয়িক কাজ। দেশভক্তি চাই কি গান গেয়েই আমরা নিঃশেষ করে দিতে পারি, অপর পক্ষে রাজনীতি চাই কি একটা স্বত্বের মামলা মাত্র হয়ে উঠতে পারে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, গান গাওয়া ও বক্তৃতা করা ছাড়াও দেশভক্তির আরও ঢের কাজ আছে। একটি জগৎ-বিখ্যাত ফরাসী লেখক আজীবন দুনিয়া দেখে শুনে শেষটা মানুষকে একটা অমূল্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি সকলকে ডেকে বলেন—"নিজের জমি আবাদ করো।" আমিও আমার স্বজাতিকে বলি, নিজের জমি আবাদ করো। এ জমি শুধু ধানের জমি নয়, মনের জমিও বটে, জ্ঞানের জমিও বটে, ধর্ম্মের জমিও বটে, কর্ম্মের জমিও বটে। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নিজের জীবন নিজে গড়ে তুলতে কোমর না বাঁধব, ততদিন আমাদের পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেইহ বে, আর তার ফলে ক্ষণিক উল্লাসের পিঠ পিঠ আমাদের আক্ষেপ করতে হবে।

(৬)

জমি আবাদ করতে হলে, প্রথমে জমি চেনা চাই। আমি "রায়তের কথায়" এক জায়গায় বলেছি যে, এদেশে এমন মানব

জমিন পতিত রয়েছে, যা আবাদ করলে ফলত সোনা। আর সে মানব জমিন হচ্ছে বাঙলার কৃষক-সম্প্রদায়।

পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা একটা নূতন কথা শুনলে, না ভেবে চিন্তে তার একটা প্রতিবাদ করে বসেন, কেননা ভাববার চিন্তবার অভ্যাস তাঁদের নেই, আছে শুধু প্রতিবাদ করবার। তার্কিকদের এ উপদ্রব আমাকে অপর ক্ষেত্রেও সহ্য করতে হয়েছে এবং সেই সূত্রে আমার কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভও হয়েছে।

আমি কলম ধরে অবধি এই মত প্রচার করছি যে, বাঙলা-সাহিত্য বাঙলা ভাষাতেই লেখা কর্ত্তব্য। আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায়, আমাদের অভ্যস্ত ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষার প্রসাদে ও প্রভাবে একটি নূতন ভাষা গড়ে তুলেছি—যে-ভাষা আধ-বাঙলা আধ-সংস্কৃত এবং যে ভাষার নাম সাধুভাষা। আমরা বলি বাঙলা, লিখি সাধুভাষা। মুখের কথার সঙ্গে বইয়ের কথার এই বিচ্ছেদটা দূর করার প্রস্তাব করবার দরুণ আমার বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ আনা হয় যে, আমি বঙ্গসাহিত্যের ইজ্জৎ নষ্ট করছি, আমি ইতর কথাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি, আমি মুড়ি-মিছরির একদর করছি, এক কথায় বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বনাশ করতে প্রস্তুত হয়েছি। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে বহু তর্কাতর্কি বহু বকাবকি, বহু রাগারাগি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। এর ফল কি দাঁড়িয়েছে? —আজ নূতন লেখকের দল প্রায় সকলেই নিজের জবানী কথা কইছেন, উপরন্তু বঙ্গসাহিত্যের দু-একটিমহারথী যাঁরা আমার উপর শব্দভেদী বাণনিক্ষেপ করেছেন, তাঁরাও আবার কেঁচেমাতৃভাষাতেই গণ্ডুষ করছেন।

তারপর আমি বহুদিন থেকে প্রচার করে আসছি যে, যতদিন না আমরা আমাদের নিজের ভাষায় শিক্ষিত হব ততদিন আমরা

যথার্থ শিক্ষিত হব না, ততদিন জ্ঞান বিজ্ঞান সকলই আমাদের মুখস্থ থাকবে, কিছুই আমাদের মনস্থ হবে না। বিদেশী ভাষায় শিক্ষালাভ করে, আমাদের মনের সঙ্গে, আমাদের জ্ঞানের যে বিচ্ছেদ ঘটেছে সেই পার্থক্য দূর করবার প্রস্তাব করবার দরুণ আমার বিরুদ্ধে এই সকল অভিযোগ আনা হয়েছে যে, আমি আমাদের শিক্ষার আভিজাত্য নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছি, বাঙলা-ভাষার মত একটা ইতর ভাষাকে জ্ঞান বিজ্ঞানের বাহন করতে উদ্যত হয়েছি, বাঙলাকে ইংরাজি রাজা-সনে বসাতে চাচ্ছি—এক কথায় শিক্ষার সর্ব্বনাশ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছি। আমি আজ ভবিষ্যদ্বাণী করে রাখছি যে, কাল না হোক, পরশু বাঙলা ভাষাই বাঙালীর শিক্ষার বাহন হবে, আর তার দৌলতে, বাঙালীর মন সেইরূপ শক্তি ও ঐশ্বর্য্য লাভ করবে, বাঙলা ভাষায় লেখবার দরুণ বাঙলা সাহিত্য যে শক্তি ও ঐশ্বর্য্য লাভ করছে।

আমি কি সংস্কৃত, কি ইংরাজী কোন ভাষার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করি নি। আমার কথা এই যে মৃতভাষা ও বিদেশী ভাষা যত্ন করে শেখবার জিনিস নয়, কষ্ট করে লেখবার জিনিষ নয় তা ছাড়া অপর ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য নিজের ভাষা ভোলা কখনই হতে পারে না। দূরদেশ ও দূর কালের জ্ঞান বিজ্ঞান আত্মসাৎ করবার জিনিস। যা বাইরে থেকে আসে তা নিজের ভাষার সাহায্যেই আয়ত্ত করতে হবে, নিজের মন দিয়েই পরিপাক করতে হবে।

এই সব কারণে যখন শুনি যে আমি "রায়তের কথা" তুলে ইতর লোককে নাই দিয়ে মাথায় চড়াচ্ছি, সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি করছি, যেখানে পরস্পরের মনের মিল আছে সেখানে মনান্তর ঘটাচ্ছি, এক কথায় আমাদের অভিজাত সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন

করতে উদ্যত। তখন সে অভিযোগের প্রতিবাদ করাও নিষ্প্রয়োজন মনে করি। এস্থলে আমি শুধু একটি কথা বলতে চাই। ভাষা, শিক্ষা পলিটিক্স; সকল বিষয়েই আমার মতামতের ভিতর একটি বিশেষ মনোভাব ফুটে বেরয়। সে হচ্ছে এই বিশ্বাস যে বাঙলার নব-সভ্যতা বাঙলার জমির উপরেই গড়ে তুলতে হবে আর সে জমি শুধু চাষের জমি নয় মনেরও জমি।

(৭)

এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এ যুগে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে আমাদের জাত গড়ে তোলা। জাতি-গঠনই যে আমাদের রাজনীতির একমাত্র লক্ষ্য এ কথা মুখে সকলেই বলেন এবং মনে অনেকেই করেন। এবং প্রতি দেশসেবকই নিজের ধারণা অনুসারে এ ক্ষেত্রে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করে নেন।

আমার ধারণা এই যে আমাদের স্বজাতিকে তার ভিৎ থেকেই গড়ে তুলতে হবে। অতএব আমাদের দেখতে হবে সে ভিৎ কোথায়।

বাঙালীর মনের ভিৎ হচ্ছে বাঙলার ভাষা। আর বাঙালীর জীবনের ভিৎ হচ্ছে বাঙলার চাষা। এই চাষা শব্দটা মুখে আনতে আমার প্রবৃত্তি হয় না, কেননা কথাটার ভিতর কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞার পরিচয় ফুটে বেরয়।—যে জমি চষে তার প্রতি এই অবজ্ঞা যেমন অযথা তেমনি জাতির পক্ষে ক্ষতিকর। তাই আমি জাতীয়জীবনে কৃষক সম্প্রদায়ের স্থান নীচে হলেও তার মূল্য যে কত উচ্চ নিজের সম্প্রদায়কে সেই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

মানুষে যে দিন কৃষিকাজ করতে আরম্ভ করেছে সেই দিন তার সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছে। পৃথিবীর সকল সভ্যতাই হচ্ছে কৃষিমূল। শুধু তাই নয়—সেই দিনই পৃথিবীর একটা ভূভাগ মানুষের স্বদেশ হয়ে উঠেছে। মরুভূমি কারও স্বদেশ নয়, কেননা যে ভূমি মানুষকে অন্ন দেয় তাই মানুষের মাতৃভূমি। জন্মভূমি জননীরই তুল্য কেননা জননী শিশুকে স্তন্য দেন আর জন্মভূমি মানুষকে অন্ন দেয়। যে স্বদেশ-প্রীতির গুণকীর্ত্তন করতে করতে আমাদের দশা ধরে সে প্রীতি আদিতে কৃষকেরই মনে জন্মলাভ করে। আর সেই মাটি ভালবাসাটাই উদার হয়ে স্বদেশ-প্রীতির আকার ধারণ করেছে। আর স্বদেশ-প্রীতি যে আসলে কৃষকেরই মনোভাব তার পরিচয় প্রতি সভ্য দেশেই পাওয়া যায়। ইউরোপের গত যুদ্ধে সকল দেশেই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে যে পেট্রিয়টিক মনোভাব যে পরিমাণে কৃষকের মধ্যে আছে সে পরিমাণে কলের কুলির মধ্যে নেই। স্বদেশকে জর্ম্মাণদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ফ্রান্সের কৃষকেরা হাজারে হাজারে অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, কেননা ফ্রান্সের, কৃষকদের কাছে জর্ম্মাণদের কর্ত্তৃক ফ্রান্স অধিকার মাতৃহত্যারই তুল্য। আর যার শরীরে মানুষের রক্ত আছে সে খুনীর হাত থেকে মাকে বাঁচাবার জন্য নিজের রক্তপাত করতে দ্বিধা করে না। কি ফ্রান্স কি জর্ম্মাণী কি ইতালী সকল দেশেই যে সম্প্রদায় জমির মালিক আর যে-সম্প্রদায় জমি চষে সেই সম্প্রদায় প্রধানত Nationalist, আর যে-সম্প্রদায় কল কারখানায় মজুরি করে সে সম্প্রদায় প্রধানত internationalist। যারা কল কারখানায় মজুরি করে দিন আনে দিন খায় তাদের মনে স্বদেশ-প্রেমের চাইতে স্বজাতি-বাৎসল্য প্রবল। আর

ইউরোপের এক দেশের মজুর অপর দেশে মজুরকে তার স্বজাতি মনে করে। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, যে-স্বরাজ্য লাভের জন্য আমরা সকলে অস্থির হয়ে উঠেছি সে স্বরাজ্য আমাদের ভাগ্যে যদি কখনো জোটে, তা হলে—আমাদের কৃষক সম্প্রদায়ই আমাদের স্বদেশপ্রীতির সর্ব্বপ্রধান আধার ও নির্ভর স্থল হইবে।

আজকে যে তাদের সে প্রীতি নিজের ক্ষেতের গণ্ডী পেরয় না—তার কারণ যে শিক্ষার ফলে এ ভালবাসা উদার হয় সে শিক্ষা তাদের নেই।

ভাবের দিক ছেড়ে দিলেও, একমাত্র বৈষয়িক হিসেবে দেখলেও দেখা যায় যে কৃষক সম্প্রদায় হচ্ছে আমাদের জীবনের সর্ব্বপ্রধান আশ্রয়স্থল। ইংরেজ আসবার পূর্ব্বে এ দেশের সকল সম্প্রদায় এই কৃষিজীবীদের আশ্রয়েই জীবন ধারণ করত। শিল্পের সঙ্গে কৃষির যোগ চিরদিনই অতি ঘনিষ্ঠ, আজকের দিনেও সে যোগ নষ্ট হয় নি। বোম্বায়ের কাপড়ের কল ও বাঙলার চটের কল দেখে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখে আজ জল আসে। তাঁরা পারলে দেশটাকে একটা বিরাট কারখানা করে তোলেন কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে তুলো ও পাটের অভাবে ও-সব কল একমিনিটও চলতে পারে না, আর তুলো ও পাটের জন্ম হয় জমিতে।

একালের সঙ্গে সেকালের তফাৎ এই যে আমাদের দেশে সেকালে শুধু শিল্পের সঙ্গে কৃষির নয়, শিল্পীর সঙ্গে কৃষকের যোগাযোগটাও অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। তাঁতি জোলা কামার কুমোর, জমিদারের কাছথেকে পেত জমি ও কৃষকের কাছথেকে ধান। উঁচু জাতের লোকেরাও ঐ জমির উপসত্বের উপরই সংসার চালাত।

ব্রাহ্মণের খোরপোষ চলত—ব্রহ্মোত্তরের কৃপায়। কৃষাণের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁর যে পরিচয় ছিল তার প্রমাণ এই শ্লোক

বামন গেল ঘর।
লাঙ্গল তুলে ধর॥

সেকালে বেশির ভাগ ব্রাহ্মণ কায়স্থ লেখাপড়ার কাজের চাইতে ক্ষেতের কাজে বেশি মনোনিবেশ করতেন। ফলে কৃষির মর্য্যাদা ও কৃষকের মর্ম্ম আমাদের চাইতে সে কালের বাঙালী ঢের বেশি বুঝত। এ সত্য তাদের প্রত্যক্ষ ছিল যে সমগ্র সমাজ ঐ কৃষির ভিত্তির উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। আজকে যে কথা তর্ক করে বোঝাতে হয়—সে জিনিস ছিল তাদের চোখে-দেখা পদার্থ।

আজকের দিনে আমরা এ সত্য ভোলবার যে অবসর পাই তার কারণ, এক জমিদার ছাড়া ভদ্রসম্প্রদায়ের আর কাউকেও নিত্য নিয়মিত কৃষকের হাত-তোলা খেতে হয় না। অথচ আজকের দিনে কৃষকের উপর আমাদের যতটা নির্ভর সেকালে ততটা ছিল না। ধনসৃষ্টির দুটি উপায়—কৃষি ও শিল্পের ভিতর শিল্প আমাদের নেই, আছে শুধু কৃষি।

আমরা—যারা মাইনের চাকর, একটু খোঁজ করলেই জানতে পারব সে মাইনে আসে কৃষকের কাছথেকে—তার পর ওকালতি বলো, ডাক্তারি বলো, সবারই ফিসের টাকা, ঐ কৃষকের কাছ থেকেই আসে। কিন্তু সেটা যে আমাদের চোখে পড়ে না, তার কারণ সে টাকা আসে, হয় সরকারের তহবিল নয় জমিদারের তহবিলের ভিতর দিয়ে তার পর পাঁচ হাত ঘুরে। কথাটা যে কতদূর সত্য একটা কাল্পনিক

উদাহরণ দিয়ে তা বোঝানো যাক। আজকাল এ দেশে ধর্ম্মঘট আমাদের হাতে একটা রাজনৈতিক অস্ত্র হয়ে উঠেছে। রাজার অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করবার কারো কারো মতে ও-ছাড়া আমাদের অপর কোনও অস্ত্র নেই। ধরে নেওয়া যাক তাই। যে সব ধর্ম্মঘটের আমরা সৃষ্টি করছি তাতে যারই যা অসুবিধা হোক দুনিয়ার কাজ একরকম চলে যায়। কিন্তু ধরুন যদি কৃষকেরা পণ করে বসে যে ফসল আর তারা বুনবে না—তাহলে কি হয়? সমগ্রজাতির শুধু ভাবলীলা নয়, সেই সঙ্গে ভবলীলাও স্বল্প দিনেই সাঙ্গ হয়। এই সব কারণে আমি এ সম্প্রদায়ের অবস্থার প্রতি ভদ্র-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি। যে-কৃষি বাঙলার ঐশ্বর্য্যের মূল ও যে-কৃষক বাঙলার শক্তির আধার, সেই দুয়ের উন্নতি সাধনই—যাঁরা জাতিগঠন করতে চান, তাঁদের প্রথম কর্ত্তব্য। এই হচ্ছে আমার লেখা রায়তের কথার মূল কথা।

(৮)

আমরা যখন বলি যে, আমরা জাতিগঠন করতে চাই—তার অর্থ আমরা একজাতি গঠন করতে চাই—কেননা পলিটিক্সের হিসাবে এক দেশের লোকসমূহ একজাতি বলেই গণ্য।

আমাদের দেশে সকলকে নিয়ে একটা জাতি গড়ে তোলবার অন্তরায় হচ্ছে আমাদের জাতিভেদ।

প্রথমত ধর্ম্মের প্রভেদের দরুণ আমরা সম্পূর্ণ পৃথক দু'টি জাতিতে বিভক্ত। হিন্দু একজাতি, মুসলমান আর এক।

তারপর আমরা—যারা নিজেদের হিন্দু বলি, আমরা একজাত নই—ছত্রিশ জাত। এবং সামাজিক হিসেবে এই অসংখ্যজাত—পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন।

এ প্রভেদ পুরাকাল থেকে চলে এসেছে, তার পর ইংরাজি শিক্ষা আবার আমাদের মধ্যে নূতন একটা জাতিভেদের সৃষ্টি করেছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় একজাতি, অশিক্ষিত সম্প্রদায় আর এক।

তা ছাড়া ধনী দরিদ্রের যে জাতিভেদ সব দেশেই আছে, সে ভেদ এদেশেও আছে। আর এ কথা নিশ্চিত যে, মানুষে মানুষে এই বৈষম্য—পলিটিক্যাল হিসাবে এক জাতি গঠনের অন্তরায়। সুতরাং যিনি বাঙলায় একজাতি গঠনের প্রয়াসী তাঁর ভেবে দেখা উচিত, এর ভিতর কোন্ ভেদটি আমাদের দ্বারা দূর হওয়া সম্ভব।

ধর্ম্মের ভেদে যে জাতিভেদ ঘটেছে, সে ভেদ দূর করা যে অসম্ভব সে কথা বলাই বাহুল্য। ভারতবর্ষের লোকের মনোভাব আজও এতটা পলিটিক্যাল হয়ে ওঠে নি, আর আশা করি কখনও উঠবে না যে তারা ধর্ম্মের চাইতে পলিটিক্সকে বড় করে তুলবে—কেননা তা করার অর্থ আত্মার চাইতে সংসারকে বড় করে তোলা।

এ ক্ষেত্রে আমরা যা করতে পারি সে হচ্ছে এই যে, ধর্ম্ম যেন আমাদের পরস্পরের আত্মীয়তার প্রতিবন্ধক কিম্বা প্রতিকূল না হয়। এই কারণে ধর্ম্মের সঙ্গে পলিটিক্স জড়ানো—আমি একান্ত ভয়ের বিষয় মনে করি। কেননা এ অবস্থায় জাতিতে জাতিতে যে পার্থক্য আছে তা'ত থেকেই যাবে; উপরন্তু পরস্পরের বিরোধের সুযোগ ক্রমে বেড়েই চল্‌বে। এই কারণে আমাদের দেশে পলিটিক্যাল হিসেবে মুসলমানদের যে এক শ্রেণী আর হিন্দুদের আর এক শ্রেণী করা হয়েছে সে

বন্দোবস্তের আমি মোটেই পক্ষপাতী নই। এর ফল যে কি করে শুভ হতে পারে, তার মর্ম্ম গ্রহণ করা আমার বিদ্যেয় কুলোয় না। আর যাঁদের কুলোয় তাঁদের দূরদর্শিতারও আমি তারিফ করতে পারি নে।

সে যাই হোক—শিক্ষাজাত আমাদের এই নূতন জাতিভেদ দূর করার সাধ্য আমাদের আছে, অতএব এ দেশের উচ্চ সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিম্ন সম্প্রদায়ের মনের যে বন্ধন ছিন্ন হয়েছে, সেই বন্ধন সূত্রে পরস্পরের আবার আবদ্ধ হবার চেষ্টা আমাদের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এক দেহের অন্তরে যদি দু'টি মন থাকে যারা পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ শূন্য তাহলে সে দুয়ের উল্টোটানে সে দেহের সকল শক্তি নষ্ট হয়, সকল গতি ব্যর্থ হয়।

এখন দেখা যাক, কি উপায়ে আমরা আমাদের মনের ঐক্য ফিরে আনতে পারি। এর দুটি উপায় আছে।

প্রথম। আমরা ভদ্রসম্প্রদায় যদি স্কুল কলেজে না ঢুকি, আপিস আদালত ছেড়ে দিই, অর্থাৎ—লেখাপড়ার সম্পর্ক না রাখি, তাহলে অবশ্য আমরা দেশশুদ্ধ লোক সহজেই বিদ্যাবুদ্ধিতে একজাত হয়ে যাই।

এ উপায়টা দেখতে অতি সহজ, কেননা কিছু করার চাইতে কিছু না-করার দিকে মানুষের মনের স্বাভাবিক ঝোঁক আছে। এবং ভদ্র সম্প্রদায়ের পক্ষে এ উপায় অবলম্বন করবার প্রস্তাবও যে না হয়েছে তা নয়।

দ্বিতীয়। উপায় হচ্ছে অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে শিক্ষিত করা। আমি এই দ্বিতীয় উপায়ের পক্ষপাতী।

কেন পক্ষপাতী তার কৈফিয়ৎ দিতে গেলে পণ্ডিতের তর্ক সুরু করতে হয়। এ সভা সে তর্কের ক্ষেত্র নয়। সুতরাং একটা উদাহরণের সাহায্যে কথাটা পরিষ্কার করা যাক।

আমাদের ভদ্র-সম্প্রদায় যখন প্রথম ইংরাজি শিক্ষা লাভ করেন, তখন তাঁদের মধ্যে জনকতক উৎসাহী ব্রাহ্মণযুবক আমাদের সামাজিক জাতিভেদ তুলে দেবার উদ্দেশ্যে পৈতা ফেলে দেন! তাঁরা ভেবেছিলেন যে উক্ত উপায়ে অতি সহজে ব্রাহ্মণ শূদ্র একাকার হয়ে যাবে। কিন্তু ফলে দাঁড়াল এই যে দু'দশ জন ছাড়া আর কেউ পৈতা ফেললেন না, আর যাঁরা ফেললেন তাঁরা ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হলেন। অর্থাৎ—কি ব্রাহ্মণ-সমাজ কি শূদ্র-সমাজ উভয় সমাজেরই তাঁরা বহির্ভূত হয়ে থাকলেন।

কিছুদিন থেকে এ দেশের লৌকিক-মনের একটা উজানগতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। অনেক অব্রাহ্মণ জাত আজকের দিনে পৈতা নিচ্ছে, এক আধটি করে নয় শয়ে শয়ে কোথাও বা হাজারে হাজারে। এ উপবীত ধারণের ফলে তারা ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠে নি, কিন্তু শূদ্রত্বের অপবাদ থেকে তারা মুক্ত হচ্ছে এবং এই সূত্রে তাদের আত্মমর্য্যাদাও বেড়ে যাচ্ছে। এ প্রচেষ্টার আমি পক্ষপাতী। তাই শিক্ষাজাত জাতিভেদ দূর করবার জন্যে আমার মতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের পৈতা ফেলাটা সদুপায় নয় তার সদুপায় হচ্ছে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে মনের পৈতা নেওয়া! এই কারণেই আমি লোকশিক্ষার এত পক্ষপাতী। জনগণকে যে-শিক্ষা দিতে আমরা আজ প্রয়াসী হয়েছি জানি তার ফলে লোকসমাজ মনে ব্রাহ্মণসমাজ হয়ে উঠবে না। কিন্তু সেই শিক্ষাসূত্রে এ দুই সমাজের মনের যোগ হবে। এতে

সমগ্র সমাজের মনের শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যাবে, কেননা তখন আমাদের সমাজদেহের সর্ব্বাঙ্গে একই রক্ত চলাচল করবে।

বোধ হয় বলা নিষ্প্রয়োজন যে আমি ভদ্র সম্প্রদায়ের শিক্ষাদীক্ষা নষ্ট করতে চাই নে, অর্থাৎ—আমাদের সমাজদেহের মুণ্ডপাত করতে চাই নে। এ যুগে সব চাইতে বড় বল হচ্ছে বুদ্ধিবল, এবং জ্ঞান বিজ্ঞানই হচ্ছে বুদ্ধির প্রধান খোরাক। আমাদের মনকে সে খোরাক না যোগালে জাতির যে সর্ব্বপ্রধান শক্তি তাই ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়বে, তার চাইতে সর্ব্বনাশের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। আমি চাই চাষা ভদ্র হোক। আর আমার বিশ্বাস চাষারাও চায় না যে ভদ্র সম্প্রদায় চাষা হোক। জনসাধারণের ঐ পৈতা নেবার প্রবৃত্তি থেকেই দেখা যায় যে তারা নিজে উপরে উঠতে চায় অপরকে নীচে নামাতে চায় না।

(৯)

বিশেষ করে রায়তের কথা আলোচনা করবার জন্য এ সভায় আমি উপস্থিত হই নি। এ বিষয়ে আমার যা বক্তব্য ছিল সে সবই আমি "রায়তের কথা"য় বলেছি। যে কথা একবার বলেছি সে কথার পুনরুল্লেখ করবার কোনও প্রয়োজন নেই।

তা ছাড়া আমার কথার এমন কোনও প্রতিবাদ অদ্যাবধি আমার কর্ণগোচর হয় নি, যার দরুণ আমি আমার মতামত পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছি। দক্ষিণ কিম্বা বাম কোন মার্গের পলিটিসিয়ানরা আমার কথার এমন কোন জবাব দেন নি, যার উল্টো জবাব দেওয়া দরকার।

এমন কি জমিদার সম্প্রদায়ও এ বিষয়ে চুপ করে আছেন। এর থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, রায়তের অবস্থার উন্নতিকল্পে আমি যে সব প্রস্তাব করেছি, তাতে তাঁদের বিশেষ কিছু অমত নেই।

তবে শুনতে পাই যে, কেউ কেউ আমার প্রতি এই দোষারোপ করছেন যে, রায়তের কথা তুলে আমি সাম্প্রদায়িক বিবাদের সৃষ্টি করছি।

আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের নিম্নসম্প্রদায়ের যুদ্ধ বাধানোর অভিপ্রায়ের লেশমাত্র যে আমার মনের কোন কোণে স্থান পায় নি তার প্রমাণ এই যে, এক্ষেত্রে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মনের ও জীবনের বন্ধন দৃঢ় করা। বলা বাহুল্য যে, আমাদের ভদ্র-সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক অল্পবিস্তর জমির মালিক, অর্থাৎ—জমিদার। আমার বিশ্বাস যেখানে সে বাঁধন একেবারে ছিঁড়েও যায় নি, সেখানে তা ঢিলে হয়ে গিয়েছে। আমার এ বিশ্বাসের কারণ যে কি, তা এতক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে বলেছি।

জমিদার ও রায়তে যদি আজ যুদ্ধ বাধে, তাহলে কোন্ পক্ষ যে এ ফেরা হার মানবে তা আমি সম্পূর্ণ জানি। সুতরাং সে বিবাদের যিনি সৃষ্টি করবেন, তিনি আর যারই হোক, রায়তের উপকার করবেন না। জমিদার-সম্প্রদায় চিরকালই বাঙলার একটা প্রবল সম্প্রদায় ছিল আর আজকের দিনে সব চাইতে প্রবল সম্প্রদায় হয়ে উঠেছে। আমাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁদের একটি পৃথক সম্প্রদায় করে তোলা হয়েছে। দুদিন পরে যদি দেখা যায় যে, লাট দরবারে তাঁরাই দেশের বিধাতা হয়ে বসেছেন, তাহলে আর যিনিই হোন আমি আশ্চর্য্য হব না।

প্রজার অবস্থার আমি যে বদল করতে চাই, সে আইনের মারফৎ; আর বর্ত্তমান আইনের বদল করা আর না করার উপর

ভবিষ্যতে জমিদারের হাত অনেকটা থাকবে। সুতরাং জমিদার যদি প্রজার বিরোধী হন, তাহলে প্রজার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে কিঞ্চিৎ দেরি লাগবে।

রায়তের দুরবস্থা না ঘুচলে বাঙালী জাতির যে দেহে বল ও মনে শক্তি আসবে না, এ সত্যটা জমিদার সম্প্রদায়ের কাছেও অবিদিত থাকতে পারে না। সুতরাং তাঁরা যে জাতীয়-উন্নতির পথ আগলে দাঁড়াবেন, এ ভয় আমি পাই নে। তা ছাড়া জমিদারদের এ জ্ঞান নিশ্চয়ই আছে যে, তাঁরা যদি রায়তের উন্নতির বিরোধী হন, ত আজ হোক কাল হোক সমগ্র জাতি তাঁদের বিপক্ষ হয়ে উঠবে। আর তার ফল যে কি হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। সজ্ঞানে কেউ আত্মহত্যা করে না, কোন ব্যক্তিও নয়, কোন সমাজও নয়।

তবে একটি কথা। বিরোধের কারণ বর্ত্তমান রেখে বিরোধ কেউ চিরদিনের জন্য স্থগিত রাখতে পারে না। তুমি যদি শুধু তোমার স্বার্থ দেখ, তাহলে আমিই বা কেননা আমার স্বার্থ দেখব এই হচ্ছে মানুষের সহজ কথা। আমি প্রজার হয়ে যে সকল দাবী করেছি, সেগুলি মঞ্জুর করলে, জমিদার রায়তের বিরোধের সম্ভাবনা অনেক কমে আসে। সুদূর ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না, তাই আমরা বর্ত্তমান সমস্যার একটা বর্ত্তমান মীমাংসার পথ দেখাতে চেষ্টা করেছি।

গৃহ-বিবাদ সৃষ্টি করবার অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে যে কেন আনা হয়েছে, তা আমি বেশ জানি। ধনী ও দরিদ্রের ভিতর যে জাতিভেদ রয়েছে, সে ভেদ কথঞ্চিৎ পরিমাণে দূর করতে যিনি প্রয়াসী হবেন,

তাঁর বিরুদ্ধে এ অপবাদ সকল দেশে সকল ধনীব্যক্তি ও তাঁদের মোসাহেবের দল চিরদিনই নিয়মিত এনে থাকেন। পলিটিক্সের ভিতর যখনই ইকনমিক্সের সমস্যা এসে পড়ে, তখন যিনি সে সমস্যার বিচার করতে বসেন, তিনিই নিন্দার ভাগী হন। রাজনীতির লম্বা চৌড়া কথা দিয়ে অর্থনীতির কথা চাপা দেওয়া এক শ্রেণীর পলিটিসিয়ানদের চির-কেলে রোগ। কিন্তু এ চেষ্টার ফলে ইউরোপে জনগণের দারিদ্র্যের কথাটা চাপা পড়া দূরে থাক, আজকের দিনে সে-দেশের রাজনীতি ঐ অর্থনীতির নীচে চাপা পড়েছে। অতীতে কি ছিল জানি নে। কিন্তু বর্ত্তমানে পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকের জীবনযাত্রা এত কষ্টকর হয়ে পড়েছে যে, সে কষ্টের কথাটা উহ্য রেখে পলিটিক্সের স্বাধীনতার কথা বললে ইউরোপের লোক আজ তা আর কানে তোলে না। সেদেশে class war, অর্থাৎ—কারখানার মালিকের সঙ্গে তার মজুরের বিবাদটা আজ ধর্ম্মযুদ্ধ বলে গণ্য। এই সব দেখে শুনে আমার মনে হয়েছে যে, দেশের বেশির ভাগ লোকের আর্থিক অবস্থার কথাটা চাপা দিয়ে যে সকল পলিটিক্সের কথা আজকাল কওয়া হচ্ছে, তার মোহ বেশি দিন টিঁকবে না। আমাদের সমাজদেহের রোগ কোথায় এবং তার চিকিৎসা কি এ বিষয়ে আজ যদি আমরা উদাসীন থাকি, তাহলে ভবিষ্যতে সে রোগ মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। রায়তের কথা মুখ্যত তাদের ব্যথার কথা এবং সে ব্যথার কতকটা উপশম যে আমরাই করতে পারি, এই সত্যটা সকলের চোখের সুমুখে দাঁড় করানো আমার মতে প্রতি শিক্ষিত লোকের পক্ষে কর্ত্তব্য এবং আমি যথাসাধ্য সেই কর্ত্তব্য পালন করতে চেষ্টা করেছি।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমি আমাদের সম্প্রদায়কে তোমাদের কথা শোনাবার চেষ্টা করেছিলুম আর আজ আমি তোমাদের সম্প্রদায়কে আমাদের কথা শোনাতে চেষ্টা করলুম। অবস্থা তোমাদেরও ভাল নয়, আমাদেরও ভাল নয় সুতরাং সমগ্রজাতির শক্তি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য তোমাদের সঙ্গে আমাদের মনের ও জীবনের ঘনিষ্ঠ মিলনের প্রয়োজন আছে। এই আমার শেষ কথা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বিলাতের পত্র।

—:০:—

(লণ্ডন থেকে আমার একটি বন্ধু আমাকে যে পত্র লিখেছেন, তার এক অংশ প্রকাশ করছি। এর থেকে পাঠকেরা দেখতে পাবেন যে, যে সকল যুবক ভবিষ্যতে আমাদের দেশের intellectual-নেতৃত্ব গ্রহণ করবে, তাদের মনের ভিতর কি সকল মত পুষ্ট হচ্ছে। রাজনৈতিক বাজে বুলি ও হুজুগের অসারতা সম্বন্ধে তাঁদের যে চোখ ফুটছে, নিম্নোদ্ধৃত ছত্রক'টি তার নিদর্শন।—সম্পাদক।)

লণ্ডন, ২৫শে অগস্ট্, ১৯২০।

* * * *

সবুজ পত্রের জন্য প্রবন্ধ পাঠাতে পারছি নে, তার জন্য বড়ই লজ্জিত রয়েছি। মাঝে প্রায় ২৭।২৮ দিন বেশ একটু স্কটলাণ্ডে আর লেকডিষ্ট্রিক্টে বেড়িয়ে এলুম। এডিনবরায় ছিলুম প্রায় দিন তের; বাকী ক'দিন হাইলাণ্ডস্-এ, আর লেক্স্-এ। আপনার বোধ হয় ও-সব জায়গা দেখা আছে। ইন্‌ভারনেস, কোর্ট অগস্টস্, ওবান আর কেজিক,—বড় চমৎকার লাগল। মনে হ'ল, যেন ডারওয়েণ্ট-ওয়াটার বরোডেল্ অঞ্চলটা হাইলাণ্ডস্-এর চেয়েও সুন্দর। কিন্তু হাইলাণ্ডস্ এক ধরণের জিনিস, এ আর এক ধরণের। দেশে হিমালয় দেখেছি, হিমালয়ের বিরাট বিশাল রূপ না থাকলেও এদেশের পাহাড়

অতি মনোরম লাগল। আবার সেই সব জায়গায় যাবার ইচ্ছে হয়। শেষ দু'দিন ব্লাকপুল-এ কাটাই। অতি কদর্য্য লাগল এই সা-সাইড (Sea-side place) প্লেসটা—কি ভীষণ ভীড়, কি ভাল্-গারিটী—নাগরদোলা, রিং-খেলার আড্ডা, সমুদ্রের ধারের রাস্তায় আর বীচে লোকের গা ঘেষাঘেষি। আমাদের দেশের তীর্থস্থানের মত লোকের ঠেলাঠেলি, কিন্তু উদ্দেশ্য একেবারে অন্য রকম। এখানকার ছোটলোকেরা মিডল্ স্কুল অবধি প'ড়ে পুরাতন বিশ্বাস আর শালীনতা আর স্বাভাবিক সুরুচি হারাচ্ছে, কিন্তু কুসংস্কার বা অন্ধ-বিশ্বাস যাচ্ছে না। সেখানে (ব্লাকপুল-এ) দেখলুম ম্যাডেম লীলা, ম্যাডেম ল্যরা, ম্যাডাম কিরো-প্রমুখ খাঁটী ইংরেজ মহিলা—সংখ্যায় কম নয়—হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলছেন, ৬ পেনী থেকে শিলিং দর্শনী—আর সর্ব্বত্রই মেয়ে-পুরুষে লম্বা লাইন করে দাঁড়িয়ে গেছে। এদেশের ডেমোক্রাসীর যে উৎকট রূপ দেখছি, আমাদের দেশে এর আবৃত্তির কল্পনা করে ভীত হয়ে যাচ্ছি, বোধ হয় ডেমোক্রাসী কোথাও টিকবে না। আরিষ্টোক্রাসী ছাড়া ভাল শাসন যেন হওয়া সম্ভব নয়। রুষেও তো নাকি বল্‌শেভিক্-তন্ত্র এখন জনকতক মাথাওয়ালা লোকের ইঙ্গিতে চ'লছে। Emancipation of the intellect, freedom of the spirit—এ সব বুলী দেশে শুনতুম—কোথায় সে সব? মনে হয়, বুঝি সাবেক কালের চাল-চিন্তা এখনকার চেয়ে ভাল ছিল, শোভন সুন্দর ছিল। কিন্তু এখন অবশ্য তার টিঁকে থাকা অসম্ভব, কারণ জীবণ ঢের বেশি জটিল হ'য়ে যাচ্ছে। The goldon age that never was—তার জন্য অতীতের দিকেই তাকাতে ইচ্ছে করে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি বড়ই নিরাশ হ'য়ে প'ড়ছি।

স্কটলাণ্ডে মুমূর্ষু গেলিক ভাষার অবস্থা স্বচক্ষে দেখা গেল। এত বড় একটা ভাষা (গেলিক আর আইরিশ একই ভাষা), ১৫০০ (খ্রীঃ) পর্য্যন্ত যার সাহিত্য পশ্চিম-ইউরোপের সব চাইতে বড় সাহিত্য ছিল, যে-ভাষা এক সময়ে সমস্ত পশ্চিম-ইউরোপে চ'লত (খ্রীঃ পূঃ ৪০০ থেকে কেল্টিক ভাষার প্রচার ছিল প্রায় সমগ্র পশ্চিম-ইউরোপে) এখন তার চর্চ্চা নেই, আদর নেই, হাজার তিরিশেক জেলে আর চাষার ভাষা হয়ে তার অবশিষ্ট বছর তিরিশ চল্লিশের জীবন গুজরাচ্ছে। আইরীশরা সংখ্যায় চার মিলিয়ন, এর মধ্যে বিশ হাজার লোক গেলিক বলে। ইংরেজের হাত এই গেলিক ভাষা আর কেল্টিক কালচার আর স্পিরিটকে ধ্বংশ করতে কম ছিল না। তাই আইরীশ লোকেরা, মুখ্যতঃ ইংরেজ-বিদ্বেষের বশে, আইরীশ-গেলিকের পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যর্থ-প্রয়াস করছে। আমি ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতার বহুত্বে বিশ্বাস করি; সব ধুয়ে মুছে যাক, এক বিশ্বভাষা বিশ্বসভ্যতা তার জায়গায় চলুক, এই মতে আমি বিশ্বাস করি নে, একে সম্ভবপর বিবেচনা করি নে, কল্যাণকর বলেও ভাবি নে। A federation of cultures, languages, religions—not their suppression by one type. ইংরেজ ব'নে-যাওয়া হাইলাণ্ডার অতি ভীষণ জীব; এই জন্যই বাইরে—the Scot is the better Englishman. যেমন জার্ম্মাণ ও পোলিশ য়িহুদী আজকাল ইংলণ্ডে গোঁড়া ইংরেজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

খিলাফৎ ডেলিগেশনের কর্ত্তারা এখানে খুব খানিক হৈচৈ করলেন। দেখ্‌ছি, স্বদেশী আন্দোলোনের যুগে যে সব Mushroom patriots উঠেছিলেন, লম্ফে ঝম্পে, বোকামিতে, গোঁড়ামিতে * * প্রমুখ

সে সব ভুঁইফোড়দের চেয়ে একটুও কম নন্। এই দলের লোকেরা তোফা আছেন—আহার বিহার ভ্রমণ বেশ চ'লছে—কিন্তু কাজ কিছু কর'তে পারলেন না। এঁরা তুর্কীকে উদ্ধার করবার জন্য আমেরিকাতে প্রয়াণ করবার মানস করছিলেন, কিন্তু একটি বাঙালী মুসলমান এই রকম ক'রে না-হক্ গরীব ভারতবর্ষের পয়সা খরচ করবার বিরুদ্ধে দাঁড়ানতে শীগ্‌গিরই সবাই ঘরে ফির্‌ছেন। বোধ হয় আলিগড়া-ইট্ ইয়ং টার্কদের সঙ্গে থেকে, এঁদের সাহচর্য্য তাঁর বড় সুখকর লাগছে না। যে মুসলমান চোস্ত উর্দু ব'লতে পারে না, আলিগরাইটরা তাকে কৃপার চক্ষে দেখে—তার সঙ্গে একটু প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের দৃষ্টিতে কথা কয়। * * * * * *

কৈফিয়ৎ।

—:*:—

আমার বন্ধু বান্ধবেরা গত কংগ্রেস সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছেন। এ আলোচনা একটু ধীর ভাবে করা কর্ত্তব্য, কেননা আপাত দৃষ্টিতে এ কংগ্রেস যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে তা এক হিসেবে যেমন হাস্যকর আর এক হিসেবে তেমনি গুরুতর। কংগ্রেস সম্বন্ধে একটা মতস্থির করবার পক্ষে ইংরাজিতে যাকে public opinion বলে, তার থেকে কোনরূপ সাহায্য আজ পাওয়া যাচ্ছে না। এ বিষয়ে যাঁর সঙ্গেই কথা কও না কেন, দেখতে পাবে তাঁর মত সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব, অর্থাৎ—সে মত অপর কারোও মতের সঙ্গে মেলে না। আমি ইতিপূর্ব্বে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিষয়ে এহেন ঘোর মত-ভেদের পরিচয় পাই নি। মহাত্মা গান্ধির প্রস্তাবের যাঁরা বিপক্ষে তাঁদের পরস্পরের মতেরও যেমন কোন মিল নেই, যাঁরা পক্ষে তাঁদের পরস্পরের মতেরও তেমনি মিল নেই। গত কংগ্রেস আর কিছু করুক আর নাই করুক, দেশের লোককে অব্যবস্থিতচিত্ত করে রেখে গিয়েছে। এই কারণে এ কংগ্রেস সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য তা বারান্তরে লিপিবদ্ধ করব।

এই কংগ্রেসের সঙ্গে আমার যেটুকু ব্যক্তিগত সংস্রব ছিল আজ সেই সম্বন্ধে দুটি একটি কথা বলতে চাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমি যখন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট বাঙলার নবগঠিত কাউন্সিলের একটি সদস্য পদপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াই তখন আমাদের শিক্ষিত সমাজ একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলেন কিন্তু অসন্তুষ্ট হন নি, তারপর সেদিন যখন আমি আমার সে অভিপ্রায় ত্যাগের কথা প্রকাশ করি, তখনও আমাদের শিক্ষিত সমাজ একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলেন, এবং এ সংবাদ শুনে অনেকে যেমন সন্তোষ প্রকাশ করেছেন, কেউ কেউ আবার তেমনি অসন্তোষও প্রকাশ করেছেন। এতে অবশ্য আমি আশ্চর্য্য হই নি—কেননা আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, কংগ্রেসের প্রস্তাবানুযায়ী আমাদের কর্ত্তব্য যে কি, সে বিষয়ে লোকমতের কোনরূপ ঐক্য, কোনরূপ স্থিরতা নেই।

যেহেতু আমি বাঙলার কোনও পলিটিক্যাল-পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট নই—সে কারণ অনেকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার পক্ষে কংগ্রেস-পার্টির অপর বিশ জনের মতানুসরণ করবার কারণ কি?

এস্থলে আমি আমার ব্যক্তিগত মতই প্রকাশ করব—কেননা, আমরা অনেকে এক কাগজে নাম স্বাক্ষর করলেও আমার ধারণা, আমাদের মধ্যে প্রতি ব্যক্তিই নিজের নিজের হিসেব থেকে কাউন্সিলের সদস্য হবার অভিপ্রায় ত্যাগ করেছেন।

কাউন্সিল বয়কট করার যে কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ কিম্বা সার্থকতা আছে, এরূপ বিশ্বাস আমার কোনও কালে ছিল না, আজও নেই। আমি কি কংগ্রেসে, কি লোক-সমাজে, উক্তরূপ বয়কট করবার স্বপক্ষে অদ্যাবধি এমন কোনও যুক্তি তর্ক শুনি নি, যার দরুণ আমার পূর্ব্বমত ত্যাগ করতে আমি বাধ্য হয়েছি। ধরে নেওয়া যেতে

পারে যে, এ বিষয়ে অধিকাংশ বাঙালী একমত—নচেৎ কংগ্রেসের বাঙালী কর্ত্তাব্যক্তিরা কখনই কাউন্সিলে প্রবেশ করবার চেষ্টা করতেন না, এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিতেন না। যাঁরা বলেন যে, কাউন্সিলকে দক্ষযজ্ঞে পরিণত করবার উদ্দেশ্যে তাঁরা সেখানে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের কথা একেবারেই মিছে—কেননা, ও-কথা তাঁরা তাঁদের ভোটারদের কাছে বলেন না। অতএব এ বিষয়ে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যাঁরা ভোট দিয়েছিলেন তাঁরাও যে উক্ত প্রস্তাবানুসারে চলতে বাধ্য—এ মত আমি গ্রাহ্য করতে পারি নে। আমার মতে যাঁরা ভারতবর্ষীয় প্রাদেশিক Congress Committee-র মেম্বর, তাঁরা উক্ত প্রস্তাব শিরোধার্য্য করতে অবশ্য বাধ্য, বাদবাকী সকলে নয়। কেননা কংগ্রেস পার্লিয়া-মেণ্ট নয় এবং কংগ্রেসের প্রস্তাবও আইন নয়। তবে এ কথা আমি মানি যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিব্যক্তি যদি তার মতের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে ও সেই অনুসারে চলতে বদ্ধপরিকর হয় তাহলে রাজনীতির কাজ চলে না, কেন না ও-হচ্ছে দশে মিলে করবার কাজ।—

এ অবস্থায় যাঁরা কাউন্সিলের সদস্য পদপ্রার্থী হয়েছিলেন, তাঁরা কংগ্রেসের মত উপেক্ষা করতে পারতেন, যদি তাঁরা জানতেন যে তাঁদের electorate-এর মত অন্যরূপ।

আমাদের পক্ষে নিজ নিজ electorate-র বেশির ভাগ লোকের মত জানা অসম্ভব। এই কারণে আমি কংগ্রেসের মত গ্রাহ্য করা সঙ্গত মনে করি। যত দিন না দেশে electorate organisation

গঠিত হচ্ছে তত দিন কাউন্সিলের ক্যাণ্ডিডেট্‌দের পক্ষে কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স প্রভৃতির মতানুসারে চলা ছাড়া উপায়ান্তর নেই—কেন না সে মত যে electorate-এর মত নয়, এমন কথা আমরা জোর করে কেউ বলতে পারি নে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী